হে রুদ্র সন্ন্যাসী

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মূল্য দশ আনা

উৎসর্গ

চারণাচার্য্য

অধ্যাপক সুধীরচন্দ্র লাহা মহাশয়ের

করকমলে

সুবিদ্বান, সুরসিক, স্বদেশবৎসল,

প্রেমের সৌরভে পূর্ণ প্রাণ-শতদল,

প্রশান্ত আননে শুভ্র সারল্যের হাসি,

তোমারে দিলাম মোর 'হে রুদ্র সন্ন্যাসী'

বিজয়

হে রুদ্র সন্ন্যাসী

অনুষ্টুপ্, রত্নোদধি, জয়নগর (২৪ পরগণা) হইতে
"গ্রন্থাগার সজীব করণ গ্রন্থমালা"র প্রথম গ্রন্থরূপে
গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
শক্তি প্রেস, ২৭।৩বি হরি ঘোষ ষ্ট্রীট হইতে
মুদ্রাকর শ্রীআশুতোষ ভড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

গান্ধি মহারাজ

গান্ধি মহারাজের শিষ্য
কেউ বা ধনী কেউ বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল,—
গরিব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।
ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে,
ঐ যে তোমার চোখ-রাঙানো
খোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো,
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।
সিধে ভাষায় বলি কথা,
স্বচ্ছ তাহার সরলতা,
ডিপ্লম্যাসির নাইকো অসুবিধে;
গারদখানার আইনটাকে
খুঁজতে হয় না কথার পাকে,
জেলের দ্বারে যায় সে নিয়ে সিধে।
দলে দলে হরিণবাড়ি
চল্‌ল যারা গৃহ ছাড়ি
ঘুচল তাদের অপমানের শাপ,
চিরকালের হাতকড়ি যে
ধূলায় খসে পড়লো নিজে,
লাগলো ভালে গান্ধিরাজের ছাপ।

উদয়ন
১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪০, সন্ধ্যা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩৪৭ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

গান্ধীর অহিংসা কি তামসিক অহিংসা ?

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' প'ড়ে খুশী হয়েছি, উপকৃত হয়েছি। জোরালো বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিমা নিয়ে তিনি ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু-সমাজের বহুবিধ সমস্যার আলোচনা করেছেন—সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে হিন্দু-সমাজের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান করবার এই চেষ্টা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই। হিন্দু-সমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই বই যাঁরা পড়বেন তাঁরা উপকৃত হবেন, সন্দেহ নেই। অস্পৃশ্যতার মহাপাপ হিন্দু-সমাজের কি ভীষণ ক্ষতি করেছে, ধরিত্রীমাতার ক্রোড় থেকে বিচ্যুত হ'য়ে বাংলার হিন্দু কেমন ক'রে আপনাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে চলেছে, যৌথপরিবার প্রথার মধ্যে যে সংঘজীবনের আদর্শ ছিল যার আধুনিক প্রকাশ সোস্যালিজমে —সেই আদর্শ হারিয়ে হিন্দু-সমাজ কেমন ক'রে দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে, জাতিভেদ বিলোপের জন্য অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন এবং

অসবর্ণ বিবাহ এ দুয়ের কেন প্রয়োজন—প্রফুল্লবাবু চমৎকারভাবে তা দেখিয়েছেন। এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

হিংসা এবং অহিংসার কথা লিখতে গিয়ে তিনি লিখেছেন 'বস্তুত হিংসা ও অহিংসার সুসঙ্গত সামঞ্জস্য সাধনেই মানব-সভ্যতার পূর্ণ আদর্শ।' এখানেও তাঁর সঙ্গে আমি একমত। হিংসার সঙ্গে ন্যায়ের চিরবিরোধ নেই ; ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়েরই চিরবিরোধ। হিংসা যেখানে ন্যায়ের সেবায় নিয়োজিত সেখানে তা দোষের ব'লে মনে করি নে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ন্যায়ের জয়ধ্বজাকে উড্ডীন রাখবার জন্য গাণ্ডীব ধরিয়েছেন। গীতার আদর্শ গুণাতীত হবার আদর্শ, অহিংসার আদর্শ নয়, হিংসার আদর্শও নয়। হিংসা সেখানেই সর্ব্বনেশে যেখানে সে অন্যায়ের কিঙ্করী। ম্যাকিভার তাঁর Community বইতে ঠিকই লিখেছেন,

"Every true cause yokes might to right, every untrue cause yokes might to wrong. The opposition lies between right and wrong only, between might and weakness only."

"যার ভিত্তি সত্যে এমন প্রত্যেক আদর্শই শক্তিকে ব্যবহার করে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য। যা অসত্য তাই শুধু শক্তিকে

ব্যবহার করে অন্যায়কে কায়েম রাখবার উদ্দেশ্যে। ন্যায়ের সঙ্গে কেবল অন্যায়েরই বিরোধ, শক্তির সঙ্গে কেবল ক্লৈব্যেরই দ্বন্দ্ব।"

এখানে একটা কথা শুধু প্রফুল্লবাবুকে স্মরণ করিয়ে দিই। সর্ব্বকালে সর্ব্বঅবস্থাতে অহিংস থাকবার আদর্শও হিন্দু শাস্ত্রেই আছে। পতঞ্জলি প্রণীত যোগদর্শনে সেই অহিংসাকে সার্ব্বভৌম মহাব্রতের মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে যা জাতি, দেশ ও কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন। "এতে জাতিদেশকাল-সময়ানবচ্ছিন্না সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম।" তা ছাড়া গীতার গুণাতীত আদর্শের মহিমাগানে উচ্ছ্বসিত হওয়া যত সহজ—সেখানে পৌঁছানো তত সহজ নয়। সত্ত্বগুণের সম্যক্ অনুশীলন ব্যতীত গুণাতীত হওয়া যে সম্ভব নয়, একথা গীতারই কথা। অতএব গুণাতীতের আদর্শকে বড় ক'রে দেখাবার জন্য অহিংসার আদর্শকে ছোট করবার সময় একটু ভেবে চিন্তে করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু প্রফুল্লবাবু 'গান্ধী আজ সেই তামসিক অহিংসার বাণীই প্রচার করিতেছেন'—এমন একটা আজগুবি কথা হঠাৎ লিখতে গেলেন কেন ? কুড়ি বছর আগে গান্ধী অহিংসার যে ব্যাখ্যা করতেন—আজও তো সেই ব্যাখ্যাই ক'রে থাকেন। সেই ব্যাখ্যার মধ্যে ভীরুতার তো কোন স্থান নেই। Cowardice should have no place in the national dictionary অর্থাৎ জাতীয় জীবনের অভিধানে

ভীরুতা ব'লে কোনো শব্দ থাকবে না—এই কথাই তো গান্ধী বারম্বার আমাদের কর্ণে উচ্চারণ করেছেন। অনেক বছর আগে আনন্দবাজার গান্ধীজীর বাণী বড় বড় অক্ষরে ললাটে নিয়ে প্রতি প্রভাতে যখন দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হ'ত, গান্ধীজীর জয়ডঙ্কা বাজিয়ে দিকে দিকে অভিযানে বাহির হ'ত, তখন কিন্তু প্রফুল্লবাবু গান্ধীর বাণীর মধ্যে বীর্য্যহীন অহিংসার কোনো নিশানাই পান নি—তাঁর প্রচারিত অহিংসা 'দুর্ব্বল ও নির্বীর্য্যের তামসিক অহিংসা'—আনন্দবাজারের হালে ব'সে এমন কোনো কথা উচ্চারণ করেন নি। বৈষ্ণব প্রফুল্লচন্দ্রের আনন্দবাজার বৈষ্ণবী ঢঙে সর্ব্বাঙ্গে গান্ধীর ছাপ বহন ক'রে তখন সবরমতীর ঋষির গুণকীর্ত্তনে ব্যস্ত ছিল। আনন্দবাজার তখন গান্ধীর প্রতিধ্বনি,—আনন্দবাজারের সম্পাদক তখন গান্ধীর ছায়া। গান্ধীর অহিংসার মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র দেখেছিলেন নির্ভীক সেনাপতির শৌর্য্যের অগ্নি-শিখা। আজ সহসা আনন্দবাজারের আপিসে ব'সে প্রফুল্লবাবু আবিষ্কার করেছেন—গান্ধী মানুষটা ভারতবর্ষকে ক্লৈব্যের পঙ্কে ডুবাতে ব'সেছেন। এই ডিগ্‌বাজি খাওয়ার কারণ কি? গান্ধী কি কোথাও বলেছেন শক্তির ঔদ্ধত্যের কাছে মাথা নোয়াতে? অত্যাচারের সামনে নতজানু হ'তে? ১৯৩৯এর ৩১শে মে গান্ধী রাজকোটে কাটীহারের কর্ম্মীদের লক্ষ্য ক'রে বললেন,

গান্ধীর অহিংসা কি তামসিক অহিংসা ?

"আমি যখন চলে যাব তখন একথা যেন কেউ না বলে—জাতটাকে আমি শিখিয়েছি ভীরু হ'তে। তোমরা যদি মনে কর আমার অহিংসা ক্লৈব্যের নামান্তর অথবা জাতটাকে ক'রে তুলবে ভীরুর জাত তবে কোনো রকম দ্বিধা না ক'রে অহিংসাকে বর্জ্জন করাই তোমাদের উচিত। কাপুরুষের মতো ম'রো না। তার চেয়ে ঘুঁসি দিয়ে এবং ঘুঁসি খেয়ে যদি মরতে পার—সে মৃত্যু দেখে আমি খুশী হব। যে অহিংসার স্বপ্ন দেখছি আমি—অসম্ভব হ'লে তাকে ত্যাগ করা ভাল তবুও অহিংসার মুখোস পরে থাকা ভাল নয়।"*

সেদিনও হরিজন পত্রিকায় লিখেছেন,

"দুষ্কৃতকারী লোকেরা যে কেউ হোক না কেন, তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় সবাইকে শিখতেই হবে। এখানে হিংসার এবং অহিংসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অহিংসার পন্থা সব সময়েই যে প্রকৃষ্ট পন্থা—এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে এই পন্থা যেখানে অবলম্বন না করে—সেখানে আত্মরক্ষার জন্য হিংসার পথ অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় এবং সম্মানজনক

* "Let no one say when I am gone that I taught the people to be cowards. If you think my ahimsa amounts to that, or leads you to that you would reject it without hesitation. I would far rather that you died bravely dealing a blow and receiving a blow than died in abject terror. If the ahimsa of my dream is impossible you can reject the creed rather than carry on the pretence of non-violence."

দুইই। এ রকম ক্ষেত্রে আক্রমণকারীকে বাধা না দেওয়াই হচ্ছে নিছক ভীরুতা এবং পৌরুষের অপমান। চুপ ক'রে থাকাটা কোন রকমেই সমর্থনযোগ্য নয়।" ✝

এই বাণীর মধ্যে প্রফুল্লবাবু নিবীর্য্যের তামসিক অহিংসার কি কোনো পরিচয় পেলেন? পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে দেশের জন্য দুঃখ বরণ ক'রত মুষ্টিমেয় আদর্শবাদীর দল। অসূর্য্যম্পশ্যা নারীরাও আজ গান্ধীর ডাকে বেরিয়ে এসেছে অন্তঃপুরের গণ্ডি থেকে—পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্বাধীনতার দুর্গম পথে, কারাগারের দুঃখকে দলে দলে করছে বরণ। স্বাধীনতার জন্য সমস্ত রকমের ক্ষতিকে হাসিমুখে সহ্য করবার এই যে ক্ষত্রিয়োচিত নির্ভীকতা—সহস্র সহস্র নর-নারীর চিত্তে এই নির্ভীকতা এনে দিয়ে গান্ধীজী ক্লৈব্যকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, না জাতির ললাট থেকে ভীরুতার কালিমা মুছে দিয়েছেন? প্রফুল্লবাবু গান্ধীজীর দেশের মানুষ হ'য়ে

✝ "People must everywhere learn to defend themselves against misbehaving individuals, no matter who they are. The question of nonviolence and violence does not arise. No doubt the nonviolent way is always the best, but where that does not come naturally the violent way is both necessary and honourable. Inaction here is rank cowardice and unmanly. It must be shunned at all cost."

(Harijan—June 28, 1942)

তাঁর জীবন ও বাণীর যে বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে পারেন নি—রোমা রলঁ্যা বিদেশের মানুষ হ'য়ে সে বৈশিষ্ট্যকে অনায়াসে বুঝতে পেরেছেন। গান্ধীর কথা লিখতে গিয়ে রলঁ্যা লিখেছেন,

"No one has a greater horror of passivity than this tireless fighter who is one of the most heroic incarnations of a man who *resists*. The soul of his movement is active resistance—resistance which finds outlet, not in violence but in the active force of love, faith and sacrifice." (Mahatma Gandhi by Romain Rolland, p. 46.)

"এই অক্লান্ত যোদ্ধা নিষ্ক্রিয়তাকে যেমন ঘৃণা করেন এমন আর কেউ নয়। তাঁর মধ্যে আমরা দেখছি মানুষের যে যোদ্ধৃরূপ তারই বীর্য্যময় প্রকাশ। তাঁর আন্দোলনের মর্ম্ম হচ্ছে সক্রিয়ভাবে বাধা দেওয়া। অন্যায়কে বাধা দেওয়ার সেই অভিব্যক্তি হিংসার মধ্য দিয়ে নয়,—প্রেমের, বিশ্বাসের এবং আত্মোৎসর্গের সক্রিয় শক্তির মধ্য দিয়ে।"

কিন্তু প্রফুল্লবাবুর সমালোচনা করতে গিয়ে একটা কথা আমি ভুলে যাচ্ছি। সত্যিকারের যিনি মহৎ তাঁকে ঠিকমত বুঝ্‌তে গেলে দৃষ্টির স্বচ্ছতা থাকা দরকার। রলঁ্যার কাছে যা আশা করবো—প্রফুল্লবাবুর কাছে তা যদি আশা করি সেটা

মূঢ়তাই হবে। প্রফুল্লবাবু যে গৌরাঙ্গের জীবন-কথা লিখেছেন তখনকার দিনের ফিলিষ্টাইনেরা তাঁকেও বোঝে নি—বোঝেনি ব'লেই তাঁকে নবদ্বীপ ছাড়তে হ'য়েছিল—অনেক বিদ্রূপ, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। আজকের দিনেও ফিলিষ্টাইন্‌দের অভাব নেই, আর অভাব নেই ব'লেই যে মহামানব একটা ধূল্যবলুণ্ঠিত জাতিকে মহাবীর্য্যের কঠিন মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে নবজীবনের মধ্যে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুললেন তিনি তামসিক অহিংসার বাণী প্রচার করছেন—এই ভুল বোঝার দায় থেকে অব্যাহতি পেলেন না! A prophet is not honoured in his own country—এ কথাটা মিথ্যা নয়। কাছের মানুষ বড় হ'লেও তাঁকে ছোট ক'রে দেখবার দুর্ব্বলতা মানব-স্বভাবেরই একটা সনাতন দুর্ব্বলতা।

প্রফুল্লবাবু লিখেছেন, "হিংসার দ্বারা হিংসার প্রতিরোধ, বলের দ্বারা বলের প্রতিরোধ করা যায়—ইহা বাস্তব জগতের পরীক্ষিত সত্য।" প্রফুল্লবাবু ঠিকই লিখেছেন! ফরাসীরা হিংসার দ্বারা জার্ম্মানদের হিংসাকে ঠেকাতে পেরেছে! নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, গ্রীস, পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া অষ্ট্রিয়া—সবাই বলের দ্বারা বলের প্রতিরোধ করেছে! কেউ জার্ম্মানীর পদানত নয়! প্রফুল্লবাবুর দৃষ্টির স্বচ্ছতার প্রশংসা না ক'রে সত্য সত্যই উপায় নেই!

প্রফুল্লবাবু লিখেছেন, "অহিংসা ও প্রেমের আদর্শ রক্ষার জন্য কোনো রাষ্ট্রই চোর-ডাকাত, দাঙ্গাবাজ, বিদ্রোহী বা ষড়যন্ত্রকারীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারে না।" প্রফুল্লবাবু যদি গান্ধীজীর লেখা ভাল ক'রে পড়বার মত কষ্ট স্বীকার করতেন তবে তিনি দেখতে পেতেন গান্ধীজীও ৯।৩।৪০ তারিখের হরিজনে লিখেছেন,

"But no Government worth its name can suffer anarchy to prevail. Hence I have said even under a government based primarily on non-violence a small police force will be necessary."

"কিন্তু কোনো গভর্ণমেণ্টই অরাজকতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। অতএব আমি বলেছি, কোনো গভর্ণমেণ্ট মূলতঃ ননভায়োলেন্সে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও তার পক্ষে ছোট পুলিসবাহিনী রাখবার প্রয়োজন আছে।"

পুনরায় লিখেছেন,

A government cannot succeed in becoming entirely non-violent because it represents all the people.

ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে সেদিনও গান্ধীজী হরিজনে লিখেছেন,

"I expect that with the existence of so many martial races in India, all of whom will have a voice

in the Government of the day, the national policy will incline towards militarism of a modified character."

(Harijan, 21-6-42.)

গান্ধীজী আদর্শবাদী, কিন্তু সে আদর্শবাদ বাস্তবের কঠিন দাবীকে অস্বীকার করে না। অস্বীকার করলে গান্ধীজী আজ কংগ্রেসের কর্ণধার না হ'য়ে হিমাচলে গিয়ে আশ্রয় নিতেন। বাস্তবের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে ব'লেই লীডারশিপ ছেড়ে দিয়েও আজও তিনি কংগ্রেসের শিখরদেশে রাজসমারোহে বিরাজ করছেন। আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সমন্বয় ঘটিয়ে চলবার এই অনন্যসাধারণ ক্ষমতা লেনিনের প্রতিভারও বৈশিষ্ট্য। তাঁর সম্পর্কে একজন লিখেছেন, Lenin was a great student and a great theorist, but his theoretical equipment was always his servant, never his master. লেনিন বড়ো একজন থিয়োরিষ্ট ছিলেন—কিন্তু থিয়োরীকে কখনো তাঁর কাঁধে ভূত হ'য়ে তিনি চাপতে দেন নি, থিয়োরী ছিল তাঁর কিঙ্কর। আদর্শ ছিলো তাঁর ধ্রুবতারার মতো অবিচলিত কিন্তু বাস্তবের জীবন্ত প্রয়োজনকে অস্বীকার ক'রে থিয়োরীকে আঁকড়ে থাকবার মানুষ তিনি ছিলেন না। গান্ধী আর লেনিন এঁরা যদি আদর্শকে অন্ধের মতো অনুসরণ করতে গিয়ে বাস্তবের দিকে পিছন ফিরিয়ে

থাকতেন তবে অরণ্যে তাঁদের রোদন ক'রে যেতে হোতো, কোটী কোটী নরনারী তাঁদের নেতা ব'লে স্বীকার ক'রে নিতো না।

গান্ধীজী তাঁর কন্‌ষ্ট্রাক্‌টিভ্‌ প্রোগ্রাম্‌ পুস্তিকার প্রথম পাতাতেই লিখেছেন,

Practice will always fall short of the theory even as the drawn line falls short of the theoretical line of Euclid.

আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের তফাৎ হবেই। হাতে আঁকা লাইন জ্যামিতির লাইনের মত কখনোই নিখুঁত হ'তে পারে না। অহিংসার আদর্শকে ব্যবহারিক জগতে এসে কিছু না কিছু ক্ষুণ্ণ হতেই হবে। সেই আদর্শ যদি বাস্তবকে স্বীকার না করে—তা আদর্শবাদীর মগজে থিয়োরী হ'য়ে থাক্‌বে—সংসারের কোনো কাজেই আস্‌বে না। গান্ধীজী অহিংসার আদর্শকে পতঞ্জলির পাতায় তুলে রাখতে চান না—তাকে আমাদিগের এই প্রতিদিনের জগতে হাজার হাজার মানুষের জীবনে সত্য ক'রে তুলতে চান। সেই জন্য আদর্শকে বাস্তবের তাগিদে কোথাও কোথাও খর্ব্ব করতে তিনি পশ্চাদ্‌পদ নন্‌। গান্ধীজীর সমগ্র লেখাকে ভাল ক'রে বুঝে হজম করবার জন্য আমি প্রফুল্লবাবুকে অনুরোধ করি। সর্ব্বতোভাবে

কোনো মহাপুরুষকে জানবার চেষ্টা না করলে তাঁর বাণীর কদর্থ হবার সম্ভাবনা পদে পদে।

প্রফুল্লবাবু হিংসার শক্তিতে বিশ্বাসী—অহিংসার শক্তিতে তেমন বিশ্বাস তাঁর নেই। যাঁরা মানুষের মধ্যে অতিমানুষ তাঁরা মানুষের শক্তিকে কখনো ছোট ক'রে দেখেন নি। সেই জন্য দিগন্ত যখন মেঘাচ্ছন্ন তখনো তাঁরা মানুষের মনুষ্যত্বের অপরাজেয় গরিমায় বিশ্বাস হারান নি—কামান-পূজার দুর্দিনেও জোরের সঙ্গে প্রেমের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের The Religion of Manএ মানুষের নৈতিক শক্তির বিপুলতায় কবির অখণ্ড বিশ্বাসের কথাই বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে।

"But when we see that in the range of physical power man acknowledges no limits to his dreams, and is not even laughed at when he hopes to visit the neighbouring planet, must he insult his humanity by proclaiming that human nature has reached its limit of moral possibility?" (Religion of Man by Rabindranath).

"শারীরিক শক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্রে মানুষ কোনো সীমারেখাকে মানতে রাজি নয়। সে নিকটবর্ত্তী গ্রহে যাবারও আশা করে এবং সে আশা দুরাশা বলে উপহসিত হয় না। তবে কেন সে বলবে যে তার

নৈতিক শক্তি শেষ সীমায় এসে পৌঁছে গেছে ? এ কি তার মনুষ্যত্বের অপমান নয় ?”

প্রফুল্লবাবুর এবং তাঁর মত মানুষদের সঙ্গে গান্ধীজীর এবং রবীন্দ্রনাথের মত অতিমানুষদের তফাৎ হচ্ছে—এঁরা মানুষকে ছোট করে দেখেন নি, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখেছেন আর এই দেখাই ত সত্যিকারের দেখা। মানুষের মধ্যে অনন্তকে দেখেছেন ব'লেই মানুষের সম্পর্কে এঁদের আশাও অসীম। তফাৎ হচ্ছে দৃষ্টির তফাৎ। সকলের দেখবার ক্ষমতা তো সমান নয়।

সর্ব্বশেষে প্রফুল্লবাবু যেখানে জাতিভেদ অপসারিত করার কথা লিখেছেন সেখানে আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আর একটু উদার হ'তে পারতেন। সাম্যের আদর্শকে সমাজ-জীবনে জয়যুক্ত করবার চেষ্টা ব্রাহ্মসমাজ কিয়ৎ পরিমাণে করে নি, বৃহৎ পরিমাণেই করেছে। যাই হোক, ভুল-ত্রুটি নিয়েও প্রফুল্লবাবুর 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' একখানা উৎকৃষ্ট বই—একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে। তাঁকে পুনরায় আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। *

১৩৪৯ সালের জৈষ্ঠ্যের প্রবাসী হইতে পুনর্মুদ্রিত।

কল বনাম চরকা

পৌষের প্রবাসীতে সার্ যদুনাথ সরকার মহাশয় 'মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী-স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে কলের প্রশংসা করিতে গিয়া চরকার উপরে খড়্গাঘাত করিয়াছেন। তাহা তিনি করুন, কিন্তু চরকারও এমন একটা দিক থাকিতে পারে যাহাকে হাসিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। যাঁহারা দেশে চরকাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, যদুবাবুর প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হইতে পারে ভস্মে তাঁহারা ঘি ঢালিতেছেন। একথা ঠিকই, গান্ধীজী এবং তাঁহার অনুচরগণ বলিয়া থাকেন, 'চরকায় সূতা কাট—দেশ উদ্ধার হইবে।' কিন্তু গান্ধীজী কি দেশোদ্ধারের জন্য কেবল সূতার দৈর্ঘ্যের উপরেই জোর দিয়াছেন? 'কেবল চরকা চালাইলেই দেশের কল্যাণ হইবে না। প্রাচীনকালেও অনেক খঞ্জ ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোক চরকায় সূতা কাটিত, তবু তাহারা দাসত্বে ডুবিয়া ছিল।' এই কথাও তাঁহারই কথা যিনি বলিয়া থাকেন, চরকায় স্বরাজ আসিবে। যদুনাথবাবু সত্যের মাত্র আধখানা বলিয়াছেন আর ভগ্ন সত্যকে ব্যবহার করিয়াছেন নিজের অনুকূলে। কেবল চরকা চালাইলেই দেশের স্বাধীনতা আসিবে না—এমন কথা গান্ধীজী কেন বলিলেন? কারণ

তিনি জানেন, আমাদের ভীরুতাই আমাদিগকে পরাধীনতার মধ্যে অভিশপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা সাহসে ভর করিয়া যাহারা আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহাদের সহিত হাত মিলাইতে যদি অস্বীকার করি তবে শৃঙ্খল টুটিয়া যাইতে বাধ্য। গান্ধীজি বলেন,

We have simply to cultivate the will not to do the rulers' bidding. Is it very difficult? How can one be compelled to accept slavery? I simply refuse to do the master's bidding. He may torture me, break my bones to atoms and even kill me. He will then have my dead body, not my obedience. Ultimately, therefore, it is I who am the victor and not he, for he has failed in getting me to do what he wanted done. (Harijan, 7-6-42)

শাসকের হুকুম মানিব না—আমাদিগকে এই সংকল্পের শুধু অভ্যাস করিতে হইবে। ইহা কি খুবই কঠিন? দাসত্ব স্বীকারে কাহাকেও বাধ্য করা যায় কি? মনিবের হুকুমমত কাজে "না" করিয়া দিলাম। মনিব আমাকে যন্ত্রণা দিতে পারে, আমার হাড় ভাঙিয়া গুঁড়া গুঁড়া করিতে পারে, এমন কি আমাকে হত্যাও করিতে পারে। সে ক্ষেত্রে সে আমার মৃতদেহটা পাইল বটে কিন্তু তাহার আজ্ঞাপালন ত হইল না। শেষ পর্য্যন্ত জয় আমারই হইল, তাহার নয়; কারণ আমাকে দিয়া সে যাহা করাইতে চাহিয়াছিল তাহা তো পারিল না।" (হরিজন ৭।৬।৪২)

"Tyranny cannot exist unless there is passive obedience on the part of the tyrannised."

"অভিভূতের মত মালিকের হুকুম তামিল করিতে নিপীড়িতেরা যদি রাজি না থাকে তবে অত্যাচার তিষ্ঠিতেই পারে না।"

অল্‌ডাস হাক্সলীর এই মন্তব্য গান্ধীজীরই প্রতিধ্বনি এবং গভীর সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই সত্যকে বুঝিতে পারিলে সিবিল ডিসোবীডিয়েন্সের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা কঠিন হইবে না। স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুবরণের সাহসকে যত দিন সংক্রামক করিয়া তুলিতে না পারিব তত দিন স্বরাজলাভ সম্ভব নয়, এই কথা গান্ধীজী ভালো করিয়াই জানেন এবং জানেন বলিয়াই জড়বৎ মালা-জপার মতো যন্ত্রবৎ চরকা চালানোকে তিনি সমর্থন করেন না। মালিকান্দায় বক্তৃতার মধ্যে তাঁহার অনুচরগণকে লক্ষ্য করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "চরকার দ্বারা লোকের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে কি না; উহা জনসাধারণকে মজুরি করিবার যন্ত্রে পরিণত করিবে, না তাহাদিগকে স্বরাজের অহিংস সিপাহী ও সেবক বানাইবে—তাহা আপনাদিগকে দেখিতে হইবে।" অতএব দেখা যাইতেছে—'শুধু চরকায় সূতা কাটো, দেশ উদ্ধার হইবে, জাতীয় দৈন্য ঘুচিবে, পূর্ণ স্বরাজ হাতে নামিয়া আসিবে'—এমন কথা আর যাহারাই বলুক, গান্ধী কখনো বলেন না। গান্ধী বলেন, স্বরাজ আসিবে সত্যাগ্রহের

পথে আর সত্যাগ্রহের পথ হইল জোরের সঙ্গে দুঃখবরণের পথ। সেই দুঃখবরণের শক্তিকে আমরা যদি অর্জ্জন করিতে না পারি, স্বরাজ একটা কথার কথা হইয়া থাকিবে।

"If we cannot rise equal to the little suffering required of us, all talk of swaraj is futile."

ইহাই হইল গান্ধীর কথা। গান্ধী বলেন, Khadi must not fetter us. কিন্তু সত্যাগ্রহের সঙ্গে সুতা কাটাকে জড়ানো কেন? গান্ধী বলেন, চাষী এবং মজুরের দল যে শৃঙ্খলিত হইয়া রহিয়াছে তাহার কারণ তাহারা আপনাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন নহে এবং একযোগে তাহারা কাজ করিতে জানে না। গান্ধীর কাছে রাজনীতি-ক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা হইল অজ্ঞ এবং শতধাবিচ্ছিন্ন জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী এবং সংঘবদ্ধ করিয়া তোলা।

"The problem, therefore, is not to set class against class, but to educate labour to a sense of its dignity." (*Harijan*, 19 Oct., 1935).

"শ্রমিকদের আত্মমর্য্যাদাবোধ উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই কর্ত্তব্য, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘর্ষ বাধানো নহে।"

তিনি বলেন,

"Unintelligence must be removed."

"মূঢ়তাকে দূর করতেই হইবে।"

নূতন চিন্তাধারার দ্বারা জনগণের চিত্তকে বিপ্লবাত্মক করিয়া তুলিতে হইলে বক্তৃতা যথেষ্ট নহে। প্রতিদিনের নীরব সেবার দ্বারা জনসাধারণের সঙ্গে প্রাণের একটা জীবন্ত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার একান্ত প্রয়োজন আছে। সেই সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে পারিলে তবেই জনসাধারণ নেতার কথা শুনিবে, তাহার কথায় প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকিবে। চরকার এবং অন্যান্য গঠনমূলক কাজের সার্থকতা হইতেছে নেতার ও জনসাধারণের মধ্যে সেবার পথে মিলনের একটা স্বর্ণসেতু রচনা করায়। সেই স্বর্ণসেতু রচনা করিতে পারিলে তাহাদিগকে নূতন ভাবে ভাবানো অনেকটা সহজ হইবে। এইজন্যই গান্ধী বলেন,

"For me there is no political education apart from the constructive programme."

"গঠনমূলক কাজগুলিকে বাদ দিয়া আমি রাজনৈতিক শিক্ষার কথা ভাবিতেই পারি না।"

চরকা মানুষকে বৈচিত্র্যবিহীন কাজে লিপ্ত রাখিয়া তাহাকে সজীব উদ্ভিদবিশেষে পরিণত করিবে—সুতাকাটার বিরুদ্ধে এইরূপ একটা অভিযোগ যদুনাথবাবু আনিয়াছেন। চরকার চেয়ে যে কল অনেক ভাল—এই যুক্তিকে জোরালো করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডের ইতিহাস-রচয়িতাদের কথা পাড়িয়াছেন।

চরকার বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযোগ করিয়াছেন—কল যে সেই অভিযোগ হইতে মুক্ত নহে—ইহা দেখাইবার জন্য আমি খ্যাতনামা ইংরেজ চিন্তাবীর অল্‌ডাস্ হাক্সলীর লেখা হইতে এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

"The machine is dangerous because it is not only a labour-saver, but also a creation-saver. Creative work, of however humble a kind, is the source of man's most solid, least transitory happiness. The machine robs the majority of human beings of the very possibility of this happiness."

"কল সর্ব্বনেশে—কারণ কল শুধু খাটুনি কমায় না, সৃষ্টির আনন্দ থেকেও আমাদিগকে বঞ্চিত করে। কাজের মধ্যে যেখানে স্রষ্টার হাত রহিয়াছে সেখানে কাজ যতই তুচ্ছ হোক—মানুষ তাহা হইতে নিবিড় আনন্দ পায়। স্থায়িত্বের দিক হইতেও সে আনন্দের মূল্য খুব কম নয়। যন্ত্র অধিকাংশ মানুষকে এই আনন্দের সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।"

চরকায় সুতা কাটার মধ্যে সৃষ্টির একটি আনন্দ রহিয়াছে। কল যেখানে লোহার হাত দিয়া সুতা বানাইতেছে সেখানে তাহার পরিমাণ যথেষ্ট হইতে পারে—কিন্তু তাহার মধ্যে স্রষ্টার আনন্দ কোথায়? যদুনাথবাবু কলকে সমর্থন করিয়াছেন ছুটির লোভ দেখাইয়া। কিন্তু এখানেও অল্‌ডাস্ হাক্সলীর ভাষাতেই বলি,

"Leisure has now been almost as completely mechanised as labour. Men no longer amuse themselves creatively, but sit and are passively amused by mechanical devices."

"শ্রমের মতো অবকাশও আজ যন্ত্রচালিত হইয়া পড়িয়াছে! মানুষ আর নিজে কিছু সৃষ্টি ক'রে চিত্তবিনোদন করে না, যন্ত্র তার কাছে যে আনন্দ বহন করিয়া আনে জড়ের মতো বসিয়া বসিয়া সে তাকে ভোগ করে।"

মানুষের আমোদ-প্রমোদও একটা যান্ত্রিকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। সিন্‌ক্লেয়ার্ লুইস্‌এর 'ব্যাবিট্' উপন্যাসে যন্ত্র-পূজারী পাশ্চাত্যের জীবন-যাত্রার যে ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহা খুব লোভনীয় নয়। পাশ্চাত্যের কথা লিখিতে গিয়া পণ্ডিত হ্যাভেলক এলিস এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "Our ideal to-day is speed, not art." কল মানুষকে তাড়াতাড়ি কাজ করিবার শক্তি দিয়াছে একথা সত্য—কিন্তু গতি-বেগ তো জীবনের আদর্শ হইতে পারে না। চরকাকে কেন্দ্র করিয়া গান্ধী যে জীবন গড়িয়া তুলিতে চান তাহার আদর্শ 'স্পীড্' নয়; তাহা হইবে সৃষ্টির আনন্দে ভরপুর, পল্লীর শ্যামল পটভূমিকায় নির্ম্মল এবং সুন্দর, মানুষের প্রেমে শোভন এবং কল্যাণময়। কিন্তু কুটীরশিল্পকে গৌরব দিতে গিয়া গান্ধী তো যন্ত্রকে অস্বীকার করেন নাই। গান্ধীগ্রামে জাহাজ-নির্ম্মাণের

যে প্রথম কারখানা হইল তাহার উদ্বোধন করিলেন গান্ধীজীরই বিশ্বস্ত অনুচর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং সেই অনুষ্ঠান গান্ধীর আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। জাহাজ তো কুটীরে তৈয়ারী হইতে পারে না—তাহার প্রয়োজনকেও অস্বীকার করা চলে না। নূতন স্বাধীনতার সংকল্পে আছে: "চরকা এবং খাদি গঠনমূলক কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ।" এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রামমনোহর লোহিয়া গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেন—স্বাধীনতার সংকল্প-বাক্যের মধ্যে যন্ত্রশিল্পের কোনো আসন আছে কি না। উত্তরে গান্ধীজী লেখেন,

"The pledge is inclusive of the Charkha and village crafts but it is not exclusive of other industries. Among the industries may be mentioned those of electricity, ship-building, machine-making and the like."

"স্বাধীনতার সংকল্পবাক্যের মধ্যে চরকার এবং গ্রাম্য শিল্পের স্থান আছে—কিন্তু উহা অন্যান্য শিল্পকে বর্জ্জন করে নাই। ঐ সব শিল্পের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, জাহাজনির্ম্মাণ, যন্ত্রনির্ম্মাণ এবং ঐরূপ অন্যান্য নাম করা যায়।"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—গান্ধীজীর নব্যভারত সৃষ্টির পরিকল্পনা জাহাজনির্ম্মাণ, যন্ত্রনির্ম্মাণ, বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার প্রভৃতিকে বর্জ্জন করে না। গান্ধীও প্রগতিশীল

এবং সত্যিকারের প্রগতিশীল বলিয়াই যাহার যতটুকু মূল্যের উপরে অধিকার আছে—তাহাকে ততটুকু মূল্য দান করিয়া থাকেন—তাহার বেশীও নহে, কমও নহে। এ সংসারে সব কিছুরই প্রয়োজন আছে—সেই প্রয়োজনের সীমাও আছে। সেই সীমারেখাকে চিনিয়া লইবার মত যাহাদের দৃষ্টিশক্তি নাই, কোথায় গিয়া থামিতে হইবে যাহারা তাহা জানে না, যাহারা একটা দিক লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে তো চলিয়াছেই—থামিবার নাম করে না—তাহারা প্রগতিশীল না স্থাণু ইহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। প্রগতি সম্পর্কে খ্যাতনামা ইংরেজ-লেখক জি, কে, চেষ্টারটনের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার Pagoda of Progress শীর্ষক রচনার উপসংহারে আছে,

"Progress, in the good sense, does not consist in looking for a direction in which one can go on indefinitely. For there is no such direction, unless it be in quite transcendental things, like the love of God. It would be far truer to say that true progress consists in looking for the place where we can stop."

"প্রগতি মানে কোনো একটা লক্ষ্যের অভিমুখে ক্রমাগতই চলা নয়। এমন কোনো দিক নাই যে পথে আমরা অনবরতই চলিতে পারি। অবশ্য ঈশ্বরানুরাগের মতো অতীন্দ্রিয় ব্যাপারগুলি সম্পর্কে স্বতন্ত্র কথা।

সত্যিকারের প্রগতি হইতেছে—যেখানে আমাদের থামা উচিত সেখানে গতিবেগ সংবরণ করায়।"

চেষ্টারটন্ তাঁহার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিয়াছেন কাঠের দৃষ্টান্ত দিয়া। কাঠের প্রয়োজন প্রচুর—কিন্তু সেই প্রয়োজনেরও একটা সীমা আছে। আমরা কাঠের নৌকা অথবা আলমারি তৈয়ারি করি, চেয়ার এবং বেঞ্চি বানাই, কিন্তু তাই বলিয়া কাঠ দিয়া ক্ষুর অথবা টুপি বানাইতে বসি না। কাঠের প্রয়োজন যতই হউক একটা জায়গায় আমাদিগকে পূর্ণচ্ছেদ টানিতেই হয়। যেমন কাঠ সম্পর্কে—তেমনি প্রায় সব-কিছু সম্পর্কেই এই কথা খাটে—যন্ত্রশিল্পও রেহাই পায় না—কুটীরশিল্পও নয়। দুঃখের বিষয় যদুনাথবাবু চরকার মধ্যে কোন গুণই দেখিতে পান নাই—উহার সম্পর্কে নানারূপ ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন এবং যন্ত্রশিল্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে গিয়া উহারও প্রয়োজনের যে একটা সীমা আছে—তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। একচক্ষু হরিণের মত সত্যের একটা দিক লইয়া যাঁহারা মশগুল তাঁহাদের গোঁড়ামি হইতে ভগবান আমাদিগকে রক্ষা করুন। যদুনাথবাবুকে চেষ্টারটনের এই কথাটা স্মরণ করাইয়া দিই, "যাহা ভুয়ো প্রগতি তাহাকে প্রগতি মনে করিবার এই সমস্ত ভ্রান্তি মানবজাতির পুরাণো সহজ বুদ্ধিকেও ম্লান করিয়া দেয়। সেই সহজ বুদ্ধিকেই আজিও প্রত্যেকটি মানুষ তাহার দৈনন্দিন

আচরণে স্বীকার করিয়া চলে। সেই বুদ্ধি বলে: এ সংসারে সব-কিছুরই নিজের নিজের জায়গায় প্রয়োজন আছে। কোন কিছুকেই তুচ্ছ করার উপায় নাই। যেখানে তাহাদের প্রয়োজন আছে সেখানে তাহাদিগকে স্বীকার করা এবং যেখানে তাহারা ক্ষতির কারণ সেখানে তাহাদিগকে অস্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কাজ।" টাইপরাইটারের প্রয়োজন আছে বলিয়া কলমের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। সেলাইয়ের কল আসায় ছুঁচের ব্যবহারও উঠিয়া যায় নাই। চীনে কাপড়ের কলগুলি জাপানী বোমার আঘাতে ভাঙিয়া গিয়াছে। লজ্জানিবারণের জন্য সেখানকার নর-নারীকে চরকার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। থিয়োরী পণ্ডিতদের মগজকে শাসন করিতে পারে; কিন্তু সংসার চলিতেছে বাস্তবের প্রয়োজনের তাগিদে সহজবুদ্ধির হাত ধরিয়া। মহাত্মা গান্ধী যদি কুটিরশিল্পের উপরে অত্যন্ত জোর দিতে গিয়া জাহাজ তৈয়ারীর প্রয়োজনকে অস্বীকার করিতেন, তবে তিনিও যদুনাথ বাবুর মতোই ভুল করিতেন। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় ১৩৪৮-এর পৌষের প্রবাসীতে বিবিধ প্রসঙ্গের মধ্যে বস্ত্রসঙ্কট শীর্ষক আলোচ্য বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

যদুনাথবাবু লিখিয়াছেন,

"ভারতে চরখায় সুতা কাটিলে সমস্ত দিনে এক জন দক্ষ সুস্থ লোক তিন আনার বেশী মজুরী উপার্জ্জন করিতে পারে না।"

এ সম্পর্কে গান্ধীজীর মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করিলাম যদুবাবুর অবগতির জন্য। ইয়ং ইণ্ডিয়ায় 'সুতাকাটা' শীর্ষক প্রবন্ধে গান্ধী লিখিতেছেন,

দৈনিক বারো আনা উপার্জ্জন করে এমন কোনও কার্য্যক্ষম শ্রমজীবীকে চরখা কাটিবার জন্য কাজ ছাড়িতে কেহই অনুরোধ করে না। কিন্তু ভারতের বহু স্থানে এমন দরিদ্র লোকও অনেক আছে যাহারা দৈনিক তিন আনা মাত্র বেতন পাইয়াই আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান মনে করে এবং ঐ সামান্য অর্থের সাহায্যেই যাহারা দুঃসময়ের হাত হইতে মুক্তি পায়।"

ভারতবর্ষের কপর্দ্দকশূন্য সহস্র সহস্র বেকার নর-নারীর অনশনের দুঃখ লাঘব করিবার জন্য যদুনাথবাবু এখনই কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলেন? যদুনাথবাবুর অবগতির জন্য জানাইতেছি, ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ২,২৪,৪২১ জন কাটুনী (১,৬৭,৯৯৬ জন হিন্দু এবং ৫৬,২৪৫ জন মুসলমান) এবং ২১,৬৪৩ জন তন্তুবায়, ধুনুরী ইত্যাদি খদ্দর-শিল্পকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। এই যে সহস্র সহস্র হিন্দু-মুসলমান কাটুনী এবং তন্তুবায় তাহাদের অলস মুহূর্ত্তগুলিকে কাজে লাগাইয়া অনশনের দুঃখ লাঘব করিতেছে, ইহার দ্বারা তাহারা কি উদ্যমের অপচয়

ঘটাইতেছে, না শক্তিকে কাজের মধ্যে সার্থক করিবার সুযোগ পাইতেছে ?

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় চরকায় সূতা কাটার মধ্যে দাসত্বের অভিশাপ এবং কাপড়ের কলে পরিশ্রম করার মধ্যে মুক্তির আশীর্ব্বাদ দেখিয়াছেন। যন্ত্রশাসিত ইউরোপের চিন্তাবীরদের অনেকেরই কিন্তু অন্য মত। হাক্সলীর মতে "বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার এবং শিল্প-ব্যবস্থার দোষ ইহা নহে যে ইহাতে কতকগুলি লোক অত্যন্ত ধনী এবং কতকগুলি লোক অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সকলের জীবনকে একেবারে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে। এখানেই ইহার আসল গলদ। এখন মানুষ কলের পুতুল হইয়া গিয়াছে—কাজও করে কলের মতো, চিত্তবিনোদনও করে যন্ত্রের সহায়তায়। এখন সমাজ-ব্যবস্থার নিত্য নূতন জটিলতার পাকে পড়িয়া মানুষ তাহার মনুষ্যত্বের গৌরব হারাইয়া যন্ত্রের স্তরে নামিয়া যাইতেছে। আমোদ-প্রমোদের উপকরণ এখন কলই যোগাইতেছে। তাহার মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ নাই—সবই তৈরি পাই। ইহার ফলে ক্লান্তি ব্যাপকতর এবং গভীরতর হইয়া উঠিতেছে—অস্তিত্বের ভার দুঃসহ এবং জীবনধারণ অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে।" যন্ত্রশাসিত পাশ্চাত্যকে দূর হইতে কল্পনার রঙীন চশমা দিয়া দেখিলে তো চলিবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার জতুগৃহের মধ্যে যাহারা নিরন্তর রহিয়াছে, তাহাদের

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজনীয় পশ্চিমের জীবনকে ভালো করিয়া বুঝিবার জন্য। যাহা কাছের তাহা মহৎ হইলেও তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং যাহা দূরের তাহা শ্রদ্ধার যোগ্য না হইলেও তাহার প্রতি অনুরাগ মানব-স্বভাবের একটা সনাতন দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতার জন্যই যে মহামানব এই অন্তঃসারশূন্য দেউলে সভ্যতার ধারাকে একটা নূতন পথে প্রবাহিত করিবার সাধনায় আজ ব্রতী—তাঁহার চেষ্টাকে ব্যঙ্গ করিবার অভ্যাস প্রায় সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে।*

*১৩৪৮ সালের ফাল্গুনের প্রবাসী হইতে পুনর্মুদ্রিত।

লীডার চাই

একটা নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে অনেকগুলি মানুষ একত্র বসবাস করলেই যে সেখানে জাতির অস্তিত্ব থাকবে—এমন নাও হ'তে পারে। জাতির অস্তিত্ব সেখানেই সম্ভব যেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি মনে করে, আমি একটি সমগ্র জাতির মানুষ। ব্যক্তির মনে শুধু এই বোধ থাকলেই হবে না। দেশাত্মবোধের দ্বারা তার আচরণগুলিও নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। যেখানে মানুষগুলি নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত সেখানে কোন দিন জাতি গ'ড়ে উঠতে পারে না। জীবন্ত প্রগতিশীল জাতি সেখানেই গ'ড়ে উঠেছে যেখানে ব্যক্তির চেতনা স্বার্থ-চিন্তার গণ্ডিকে অতিক্রম ক'রে সমগ্র দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। জাতিকে শক্তিশালী এবং উন্নত ক'রে তুলবার অপরিহার্য্য পন্থা হচ্ছে—তার মানুষগুলির চেতনায় দেশাত্ম-বোধকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। সেই বোধ এমন সুতীব্র হবে যে, মানুষ সমষ্টির কল্যাণের জন্য নিজের স্বার্থকে হাসিমুখে বিসর্জ্জন দেবে, সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত মঙ্গলকে অনায়াসে পরিত্যাগ করবে। এখানে একটা কথা বলবার দরকার আছে। আমি সমগ্র জাতির অংশ—কেবল এই বোধ দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা দেবার

পক্ষে যথেষ্ট নয়। একটা আইডিয়া যতক্ষণ কেবল মগজের ব্যাপার হয়ে আছে ততক্ষণ তার দ্বারা আমরা বিশেষ কাজ পাইনে। আমাদিগকে কাজে নামায় আমাদিগের ভাব-প্রবণতা—যাকে ইংরেজীতে বলে সেন্টিমেণ্ট। ম্যাক্‌ডুগ্যাল ঠিকই লিখেছেন,

"It is only in so far as the object conceived becomes the object of some sentiment, that the conception of it moves us strongly to feeling and action."

দেশ বললেই যথেষ্ট হোলো না। মৃণ্ময়ী দেশকে চিত্তলোকে চিণ্ময়ী ক'রে তুলবার জন্য জ্ঞানের দৃষ্টি এবং ভাবের আবেগ চাই। সে দৃষ্টি আর আবেগ না এলে দেশের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করা যায় না। দেশ-প্রেম খুব ভালো জিনিষ, দেশের জন্য আত্মসুখ বলি দেওয়া উচিত—এই শুষ্ক কর্ত্তব্যবোধ থেকে আসে না আত্মদানের সেই দুর্জ্জয় শক্তি যার প্রকাশ আমরা দেখেছি প্রতাপসিংহ, ম্যাজ্জিনি থেকে আরম্ভ ক'রে ডি ভ্যালেরা, জওহরলাল এবং গান্ধী পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে। মানুষকে পেট্রিয়ট করতে হলে আইডিয়া আর সেন্টিমেণ্ট—এই দুটোরই যে দরকার, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মর্ম্মে মর্ম্মে তা বুঝেছিলেন। প্রত্যেক ভারত-বাসীর মনে নেশনের আইডিয়া ঢুকিয়ে দেবার জন্য তিনি

উচ্চারণ করলেন 'বন্দে মাতরম্'। জন্মভূমিই যে আমাদের সকলের জননী, একই ভারতমাতার আমরা যে সকলেই সন্তান—এই আইডিয়ারই জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ বন্দে মাতরম—এই দুইটি কথার মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন আমাদের চেতনায় শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের চিন্তা। জাতি ব'লে সেখানে কিছু নেই। Group spirit অথবা দেশাত্মবোধ ব'লে যেখানে কোনো চেতনা নেই সেখানে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা ; সেখানে বাপ-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, ঘর-সংসার—এদের চিন্তাই থাকে মনের সাড়ে পনেরো আনা জুড়ে। দেশাত্মবোধ অথবা Group spiritই মানুষকে সহস্র সহস্র মানুষের সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে দেয়, সকলের মঙ্গলের জন্য নিজের মঙ্গলকে বলি দিতে শেখায়। এই দেশাত্মবোধ যে জাতির মধ্যে যত তীব্র—তার সাফল্যের পরিমাণও তত বেশী। বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন সম্পদ, শক্তি, জ্ঞান—সবদিক দিয়ে ভারতবর্ষকে উন্নত ক'রে তুল্‌তে হ'লে যারা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে আপন আপন স্বার্থের কোটরের মধ্যে—তাদের এক সঙ্গে মেলাতে হবে যা'তে তারা একই আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একই পতাকার নিম্নে কাজ কর্‌তে পারে। ঐক্য না এলে শক্তি আস্‌বে না এবং শক্তি না এলে মুক্তিও অসম্ভব। ঐক্য তখনই সম্ভব যখন প্রত্যেকটি মানুষ মনে কর্‌তে

শিখবে—একটা সমগ্র জাতির আমি একজন। সুবর্ণ-নির্ম্মিত দশভূজা প্রতিমার মধ্যে জন্মভূমির ভাবীমূর্ত্তিকে অবলোকন ক'রে মহেন্দ্র সিংহ জিজ্ঞাসা করলেন, "মা'র এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব?" ব্রহ্মচারী উত্তর দিলেন, "যবে মা'র সকল সন্তান মা'কে মা বলিয়া ডাকিবে।' ভারতবর্ষের সকল সন্তান যা'তে আপনাদিগকে একই জন্মভূমির সন্তান ব'লে মনে করতে পারে তা'রই জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' লেখা। দেশাত্মবোধের আইডিয়া তো এলো। কিন্তু ভাবাবেগের অগ্নিশিখায় সেই আইডিয়াকে জীবন্ত ক'রে না তুলতে পারলে হাজার হাজার মানুষ তো জাতিকে উন্নত এবং শক্তিশালী ক'রে তুলবার জন্য প্রাণ দেবে না;—বন্দে মাতরমের মধ্যে যে আদর্শ রয়েছে তা' আনন্দমঠের শুকনো পাতায় নির্জীব হ'য়ে প'ড়ে থাকবে যেমন ক'রে যাদুঘরে টাঙানো থাকে প্রাণহীন মামি (mummy)। দেশভক্তির বন্যায় আসমুদ্র হিমাচল ডুবিয়ে দিতে হ'লে হৃদয়ের মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ধ্যানের জন্মভূমির জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমাকে। সেই জন্মভূমি হবে শস্যের প্রাচুর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালিনী, সোনার ধান্যে সেখানে ভরা থাকবে প্রতি গৃহের আঙিনা। সেখানে কোটী মৌনকণ্ঠে জাগবে বাণী, জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ের অন্ধকার। মেরুদণ্ড-হীন আজিকার স্বদেশ সেদিন হবে শৌর্য্যে অপরাজেয়।

মাতৃভূমির এই রকম একটা সমুজ্জ্বল ছবি চোখের সামনে দেখতে না পেলে সহস্র সহস্র মানুষ কিসের জন্য হৃদয়ের রক্ত ঢালতে উদ্যত হবে? জাতির লক্ষ লক্ষ নরনারীর অন্তরে জন্মভূমির এই প্রতিমা যেখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেখানে তাকে পদানত ক'রে রাখবার শক্তি কারও নেই—অন্তরের স্বপ্নকে বাহিরে রূপ দেবার জন্য সেখানে ঘর ছেড়ে বীরেরা বাহিরে আসবে দলে দলে ধূলিধূসরিত মুক্তপথের বুকে। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের প্রাণকে আবেগে চঞ্চল করে তুলবার জন্য আমাদের মনে জাগালেন স্বদেশের একটা জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্ন। হৃদয়ের মন্দিরে জন্মভূমির প্রতিমা যেখানে অস্পষ্ট, ব্যক্তির মনে স্বদেশ যেখানে গৌরবের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে প্রতিভাত হয় না—সেখানে জাতির জন্য সর্ব্বস্ব দানের উন্মাদনা কদাচিৎ তীব্র হ'য়ে ওঠে। জাপানীদের স্বদেশ-ভক্তিকে সুতীব্র করে তুলেছে জাপানের ভবিষ্যতকে জ্যোতির্ম্ময় করবার আশা। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের মনে দেশাত্মবোধের প্লাবন আনতে চেয়েছিলেন জাতির অতীত গৌরবকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধ'রে। 'ভারত আমার, ভারত আমার, এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র' এই বিখ্যাত গানটী জাতির গৌরবময় অতীতকে আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে।

গান্ধীজী বিশ্বাস করেন, ভারতবর্ষের একটা মিশন আছে,

আর সেই মিশন হচ্ছে মুমূর্ষু পৃথিবীকে নূতন বাণী দিয়ে বাঁচানো। এই বাণী হচ্ছে অহিংসার বাণী। একমাত্র স্বাধীন ভারতবর্ষেরই যোগ্যতা আছে জগতকে এই বাণী দান করবার। সুতরাং স্বাধীনতার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। এখানে দেশপ্রীতির মূলে ভারতবর্ষের সাধনা দিয়ে জগতকে রূপান্তরিত করবার স্বপ্ন।

জাতি তৈরী হয় অনেকগুলো কারণকে আশ্রয় ক'রে। দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে অন্যতম। যেসব দেশের প্রাকৃতিক সীমারেখাগুলি খুব স্পষ্ট তাদের মধ্যে আমরা স্বজাতিপ্রীতির আতিশয্য দেখতে পাই। গ্রেটবৃটেন এবং জাপান এই দুটো সমুদ্রবেষ্টিত দেশে দেশাত্মবোধের তীব্রতা যে এত বেশী তার একটা প্রধান কারণ তাদের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য।

আর একটা কারণ হচ্ছে জাতির বিভিন্ন অংশকে পরস্পরের কাছে পরিচিত করবার জন্য মুদ্রাযন্ত্র, রেলপথ, টেলিগ্রাফ এবং বেতারবার্ত্তার ব্যবস্থা। এইগুলোকে আশ্রয় ক'রে দেশে জনমত গড়ে ওঠে, সংবাদ ছড়িয়ে পড়বার সুবিধা পায়, আইডিয়া দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। ভাবের আদান-প্রদান ঘটাবার জন্য যেখানে রেলপথের অথবা ছাপাখানার ব্যবস্থা নেই সেখানে দেশের এক অংশ আর এক অংশকে জানবার তেমন সুবিধা পায় না, মানুষগুলির মনে

সমগ্রের বোধ অত্যন্ত অস্পষ্ট থেকে যায়, সকলের যাতে মঙ্গল হয় সেদিকে কারও দৃষ্টি যায় না—সবই কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া মনে হয়। ব্যষ্টির উপরে সমষ্টির যে প্রভাব তার মূল্য নিতান্ত কম নয়। সেই প্রভাব যেখানে ক্ষীণ সেখানে দেশাত্মবোধও দুর্ব্বল হ'তে বাধ্য। দেশের এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের যোগাযোগ ঘটানোর উপায়গুলির মধ্যে ম্যাকডুগ্যাল মুদ্রাযন্ত্রকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বহু পুরুষপরম্পরায় জাতির চিত্তে যে সব ট্র্যাডিশন্ গড়ে উঠেছে, যে সব সেন্টিমেণ্ট শিকড় গেড়েছে জাতীয় ঐক্যের পথে সেগুলিও কম সহায় নয়। জাতির উপর দিয়ে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা চলে যায় —কিন্তু জাতি তার এই tradition (সংস্কার) গুলিকে আশ্রয় ক'রে আপনার সত্তাকে অটুট রেখে দেয়।

অনেকগুলি মানুষের সমষ্টি যদি আপনাকে জাতিতে রূপান্তরিত করতে চায় তবে আরও একটা ক্ষমতা তাকে অর্জ্জন করতে হবে—পুরুষসিংহ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা। তারা জাতির জননায়কের আসন গ্রহণ ক'রে তাকে জয় থেকে জয়ের পথে পরিচালিত করবে। ম্যাকডুগ্যাল বলেছেন,

"Such personalities, more effectively perhaps than any other factors, engender national unity and bring it to a high pitch."

জাতিকে একসূত্রে বাঁধতে এবং গৌরবের উচ্চশিখরে তুলতে শক্তিশালী নেতারাই সব চেয়ে বড়ো সহায়। আফ্রিকার বেশীর ভাগই নিগ্রোদের অধীনে ছিলো ইউরোপীয়দের দখলে আসবার আগে। কিন্তু নিগ্রোরা তো দানা বেঁধে একটা জাতিতে পরিণত হতে পারলো না। কেন? ম্যাক্‌ডুগ্যাল বলছেন, নিগ্রোরা উচ্চস্তরের তেমন মানুষ সৃষ্টি করতে পারেনি যারা নৈতিক এবং মানসিক শক্তির জোরে জাতিকে একসূত্রে বেঁধে দিতে পারতো।

"We may fairly ascribe the incapacity of the Negro race to form a nation to the lack of men endowed with the qualities of great leaders even more than to the lower level of average capacity." (The Group Mind by William Macdougall. P. 136.)

পক্ষান্তরে ইহুদী জাতের মতো একটা জাত আপনার স্বাতন্ত্র্যকে অটুট রেখে এখনো যে বেঁচে আছে—বহু শতাব্দীর বহু ভাগ্যবিপর্য্যয় এখনো যে তাদের অস্তিত্বকে মহাকালের গর্ভে নিঃশেষ ক'রে দিতে পারেনি তার প্রধান কারণ তাদের মধ্যে Moses (মুশা) থেকে আরম্ভ করে বহু প্রতিভাশালী পুরুষ- সিংহের আবির্ভাব ঘটেছে।

এখানে আমরা আরব জাতির উল্লেখ করতে পারি। শতধাচ্ছিন্ন আরবে দলাদলির অন্ত ছিলো না। তাকে একসূত্রে

বেঁধে দুর্জ্জয় জাতিতে রূপান্তরিত করলো একজন মানুষের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্বের অসামান্য শক্তি। আরব জাতির সৃষ্টি মহম্মদের প্রতিভা থেকে। মহম্মদ না জন্মালে আরব জাতির গৌরবময় অস্তিত্বের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় আমরা খুঁজে পেতাম না।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমরা দেখতে পাই বিরাট বিরাট ব্যক্তির আবির্ভাব। এই সব শক্তিশালী পুরুষ আপনাদের অসামান্য প্রতিভা দিয়ে জাতিকে দান করেছে তার ধর্ম্ম, তার চিন্তার খোরাক, তার আদর্শ, তার নীতির অনুশাসন, তার আর্ট, তার সাহিত্য, তার সব-কিছু গৌরবের বস্তু। শান্তির সময়েরই হউক আর যুদ্ধের সময়েরই হউক—তার যা-কিছু জয়ের নিদর্শন সবই হচ্ছে এই সব বীরেরই দান। এই জন্যই সব জাতির মধ্যেই আমরা বীরপূজার সমারোহ দেখতে পাই। সাহিত্য, আর্ট, ধর্ম্ম, নীতি, আদর্শ—জাতির এই সব কীর্ত্তির সম্মুখে আমরা যে বিপুল গৌরব অনুভব করি, সেই গৌরববোধই তো জাতিকে একসঙ্গে বেঁধে রাখবার একটা কঠিন উপাদান।

একই সংস্কৃতির স্বর্ণসূত্রে সমস্ত চীন জাতিকে বেঁধে দেবার অনুকূলে কনফিউসিয়াস কতখানি সাহায্য করেছেন তার কি আমরা কোনো পরিমাণ করতে পারি? আমাদের উপনিষদ, আমাদের ভগবদ্গীতা যাঁদের কাছ থেকে এসেছে তাঁরা

আমাদের একসঙ্গে মিলবার পথকে কতখানি প্রশস্ত করেছেন তাও সহজে অনুমেয়। ফ্রেডারিক দি গ্রেট এবং বিসমার্ক ছাড়া কি জার্ম্মাণী তৈরী হোতো ? তাঁরাই তো জার্ম্মাণ জাত সৃষ্টি করলেন। ওয়াশিংটন, হ্যামিলটন এবং লিঙ্কন না থাকলে আজ আমেরিকার অস্তিত্ব থাকতো কোথায় ? গ্যারিবল্ডি আর ম্যাজিনি আর ক্যাভুরের প্রতিভাকে আশ্রয় ক'রে গ'ড়ে উঠলো নূতন যুগের সংঘবদ্ধ ইটালী। ইংলণ্ডের কি অবস্থা হোতো যদি তার বুকে না জন্মাতো সেক্সপীয়ারের মতো কবি, নিউটনের এবং ডারউইনের মতো পণ্ডিত, নেলসনের এবং ওয়েলিংটনের মতো বীর ?

প্রতিভায় যাঁরা প্রথম শ্রেণীর মানুষদের সমকক্ষ নন কিন্তু সাধারণের অনেক উপরে, জাতীয় জীবনকে একসূত্রে বিধৃত করে রাখবার পক্ষে তাঁদের দানও কম নয়। এঁরাই তো ভগীরথের মতো অতিমানুষদের সাধনার ধারাকে সমাজের স্তরে স্তরে ব্যাপ্ত ক'রে দেন, জনসাধারণের মনের মধ্যে নীতির আদর্শগুলিকে জীবন্ত ক'রে রাখেন। কোন্ আদর্শকে গ্রহণ করা উচিত এবং কোন্ আদর্শকে বর্জ্জন করা সমীচীন—এঁরাই জাতির শিয়রে প্রহরীর মতো জেগে থেকে সে কথা সবাইকে জানিয়ে দেন। মহাপুরুষদের প্রতিভা যতই বিরাট হোক তাঁদের আদর্শকে জাতির চিত্তে জীবন্ত ক'রে রাখবার জন্য যেখানে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিভাশালী আদর্শবাদীরা দানা না

বেঁধেছে, সেখানে সংস্কৃতির দীপ্তি দিকে দিকে ব্যাপ্ত হবার সুযোগ পায় না।

আমাদের দেশে রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, তিলক, অরবিন্দ, গান্ধীপ্রমুখ পুরুষদের আবির্ভাব না ঘটলে এই দেশব্যাপী স্বজাতি-প্রীতির বিস্তার কি আমরা আজ দেখতে পেতাম? নিজের নিজের ঘর-সংসার সামলাতে আমরা ব্যস্ত থাকতাম, মন্দিরের কোণে চোখ বুজে আমাদের পারলৌকিক কল্যাণ খুঁজতাম, কোন্ দিন বেগুন খেতে হয় না এবং কোন্ দিন অলাবু ভক্ষণ নিষেধ পাঁজিতে তার সন্ধান নিতাম। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য কারাগারের পথে বাহির হবার কথা আমাদের কল্পনাতেও আসতো না। এসেছে বঙ্কিমের মতো পুরুষ-সিংহ—তাজা তাজা জোয়ান ছেলেরা পড়েছে তাঁর ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, আনন্দমঠ। মনের মধ্যে নূতন স্বপ্ন বাসা নিয়েছে, শিরায় শিরায় রক্তধারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে —বন্দে মাতরম্ ব'লে মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে অকূল সমুদ্রে তারা পাড়ি দিয়েছে। এসেছে বিবেকানন্দের মতো মহাপুরুষ। ছেলেরা পড়েছে তাঁর বই, শুনেছে তাঁর বজ্রকণ্ঠের বাণী—দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় তারা জীবন করেছে উৎসর্গ, নতুন ভারতবর্ষ গড়বার জন্য তারা সানন্দে বেদনার জীবনকে করেছে বরণ। এসেছে তিলক, এসেছে গান্ধী। হাজার হাজার নরনারী একটা নূতন আলোকের পেয়েছে সন্ধান। তাদের জীবনের

ধারা গিয়েছে বদ্‌লে। কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে ছাত্র, আদালত থেকে বেরিয়ে এসেছে ব্যারিষ্টার, ইস্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছে শিক্ষক, ফুটপাথ থেকে চলে এসেছে হকার, লাঙল ছেড়ে চ'লে এসেছে কৃষক। এঁদের চিন্তাধারা এসেছে ঝড়ের মতো। সেই ঝড়ের স্পর্শে সহস্র সহস্র মানুষের মনের শৌর্য্য প্রদীপ্ত শিখায় জ্বলে উঠেছে। এঁরা না এলে আমরা আজ কোথায় থাকতাম? রবীন্দ্রনাথ না এলে আমাদের চিত্তভূমি ধূসর মরুর শূন্যতা নিয়ে আজ করতো খাঁ খাঁ। একথা খুব সত্য যে, জাতি সৃষ্টি করবার জন্য যোগ্য নায়কের আবির্ভাবের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। গান্ধী না এলে চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মতিলাল নেহেরু হয়তো আদালতে ব্যারিষ্টারি করতেন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু হয়তো আইনের গ্রন্থ ঘাঁটতেন, সুভাষচন্দ্র বসু হয়তো ইংরেজের আদালতে বিচারকের আসনে ব'সে মামলার রায় দিতেন, রাজাগোপালাচারী এবং রাজেন্দ্র-প্রসাদ ওকালতিতে ব্রতী থাকতেন, আচার্য্য কৃপালানী অধ্যাপনায় জীবন কাটাতেন, পাঠানজাতি আজও গৃহ-বিবাদে রত থাকতো, খাঁ আবদুল গফ্‌ফর খাঁ তাঁর তিন লক্ষ খুদা-ই-খিদ্‌মদ্‌গার নিয়ে পাঠান রাজ্যে অহিংসার জয়ধ্বজা উড়িয়ে দেখা দিতেন না। একজন মানুষের মতো মানুষ একটা বিরাট স্বপ্ন নিয়ে আবির্ভূত হ'লেন আর যবনিকার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো বীরের দল সেই

মহাস্বপ্নকে জাতির জীবনে রূপ দেবার জন্য। ম্যাক্‌ডুগ্যাল লিখেছেন :

"A people may, like the Chinese, have a high average capacity of intellectual ability but if it cannot from time to time produce men of far more than average capacity along various lines it will not progress very far spontaneously."

জাতির সাধারণ লোকগুলির বুদ্ধিমত্তার প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন দিকপাল পুরুষদের আবির্ভাব না ঘটে তবে প্রগতির পথে অনেকদূর আগিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে লীডারশিপের মূল্যকে আজ ছোট করবার বালকসুলভ চেষ্টা চলেছে। তাঁরা ভুলে যান, জনসাধারণকে চালাবার জন্য নেতার প্রয়োজন আছে। সেই উচ্চস্তরের নেতৃত্বের যেখানে অভাব সেখানে শ্মশান-কুকুরের কাড়াকাড়ি গীতি ছাড়া আর কোনো গীতি শোনা যায় না। কোনো দেশের কোনো প্রথম শ্রেণীর নায়কই জনসাধারণের কাছ থেকে পথের নির্দ্দেশ পাবার জন্য অপেক্ষা করেন না। তাঁরা ভালো করেই জানেন নেতার কাজ পরিচালনা করা এবং জনসাধারণের কাজ নেতার অনুসরণ করা। নেতা আসেন অন্তরে কলম্বাসের বিশ্বাস নিয়ে। সেই বিশ্বাস নিয়েই তাঁরা

চলেন। তাঁরা হুকুম করেন আর হাজার হাজার মানুষ সেই হুকুম পালন করে। কারও কথায় চলবার মানুষ তাঁরা নন। অন্তর থেকে তাঁরা যে নির্দ্দেশ পান সেই নির্দ্দেশই তাঁদের পথের আলো। কেউ যদি মনে করেন, পরামর্শ দিয়ে, স্তুতি ক'রে অথবা চোখ রাঙিয়ে নেতার মত-পরিবর্ত্তন ঘটানো যাবে তবে নিশ্চয়ই তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারিনে। নেতা যদি অন্যের নির্দ্দেশই মেনে চলবে, লোকের সমালোচনায় কান দিয়ে কথায় কথায় মত পরিবর্ত্তন করবে তবে নেতার সঙ্গে জনসাধারণের তফাৎ কোথায়? তাঁর বিশ্বাসের মূল্য কতটুকু? যারা তাঁর নির্দ্দেশ মেনে চলতে পারবে তারা তাঁর সঙ্গে থাকবে—যারা বিদ্রোহ করবে তাদের সরে যেতে হবে। নেতার উপরে নেতৃত্ব করবার দুরাশা খোদার উপরে খোদকারি করবার মতোই মূঢ়তা। গান্ধী ঠিকই লিখেছেন:

"And how can a leader follow the people? He has to lead them and they have to follow him."

(Harijan. 1. 9. 40.)

"নেতা যিনি—তিনি কেমন ক'রে জনসাধারণকে অনুসরণ করবেন? নেতার কাজ লোককে পরিচালিত করা, লোকের কাজ নেতার অনুগামী হওয়া।"

(হরিজন, ১।৯।৪০)

যে আসল নেতা তাকে হত্যা করা চলতে পারে, ছলে বলে কৌশলে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তাকে

দলে টানবার চেষ্টা করা বালকসুলভ চপলতা। হিটলার নির্দ্দেশ দেয়, না নির্দ্দেশ মানে? কামাল কি সকলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করেছে? লেনিন যা সত্য বলে মনে করেছে তাই করেছে। যাদের পোষায়নি তারা স'রে যেতে বাধ্য হয়েছে। গান্ধীর বেলায় কেন আমরা মনে করবো তিনি আমাদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করবেন? জনসাধারণের নেতৃত্ব করবার ক্ষমতা সম্পর্কে গান্ধীজীর মত হ'চ্ছে—তারা কোনো জিনিষ তলিয়ে ভাবতে চায় না। ৫।৭।৪২ তারিখের হরিজনে তিনি লিখ্‌ছেন—For people generally do not weigh the pros and cons of a problem. They follow their heroes. বাংলা হচ্ছে, "জনসাধারণ কোনো সমস্যার দুটো দিক তলিয়ে দেখতে অভ্যস্ত নয়। তারা তাদের নেতাদের অনুসরণ করে।" একথা ইতিপূর্ব্বেও তিনি একাধিক বার বলেছেন। জনতা নিয়ে যাদের কারবার তাদের প্রায় সকলেরই এই মত। জনসাধারণ নাটকের অভিনয় দেখে। নাটকের সমালোচনাও তারা করে কিন্তু নাটক লেখা তাদের সাধ্যাতীত। আইনের সমালোচনা জনসাধারণ করতে পারে বটে কিন্তু নাটক রচনার মত আইন রচনা করাও তাদের সাধ্যের বাহিরে। জনসাধারণ কি যে চায় তা তারা কদাচিৎ জানে। কেমন ক'রে তারা ঈপ্সিতকে পাবে—সে তাদের জ্ঞানের অতীত।

সমাজে এবং রাষ্ট্রে পরিবর্ত্তন আনবার জন্য যদি অধিকাংশ লোকের অনুমোদনের অপেক্ষা করতে হয়, তবে যে তিমিরে আছি সেই তিমিরেই যে থেকে যাবো এটা জেনে রাখা ভালো। একথাটা রাস্কিন জানতেন, ডিকেন্স জানতেন, লেনিন জানতেন, গান্ধীও জানেন। শুধু জানে না আমাদের দেশের বুড়ো-খোকারা—যারা ডিমোক্র্যাসি ডিমোক্র্যাসি বলে চেঁচিয়ে লীডারদের লোকচক্ষে হেয় করতে চায়। খ্যাতনামা চৈনিক লেখক Lin Youtang তাঁর My Country and My People পুস্তকে বিপন্ন চীনজাতির চরম আশার কথা নির্দ্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন, the best hope of China is that she has at present an inhumanly cool-minded and inhumanly stubborn leader—চীনদেশ আজ এমন একজন নেতা পেয়েছে যাঁর চিত্তস্থৈর্য্য ও মানসিক দৃঢ়তা লোকোত্তর। এখানে লীডার শিপের উপরেই চরম আশার অভিব্যক্তি। আমাদেরও চরম আশা মহাত্মা গান্ধী। আমরা এমন একজন নেতাকে পেয়েছি যিনি চীনের নেতার মতই inhumanly cool-minded এবং inhumanly stubborn. এমন নেতার অনুসরণ করতে আমরা যদি আজ কুণ্ঠা বোধ করি আমাদের কোনো আশা করবার নেই। *

*যুগান্তর পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

ভাবী নেতা জওহরলাল

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ওয়ার্দ্ধা অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করলেন—"Pandit Jawharlal Nehru is my legal heir." কথাটা একটু চমকপ্রদ সন্দেহ নেই; কারণ পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে গান্ধীজীর মতের তফাৎ বিস্তর। পণ্ডিতজীর আত্মজীবনী পড়লেই জানা যায়—গান্ধীর সঙ্গে তাঁর মতের অনৈক্য নেহাৎ কম নয়। তাছাড়া গান্ধীজী নিজেই ফাঁস করে দিয়েছেন, মতবাদ নিয়ে জওহর-লালের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই বাদানুবাদ হ'য়ে থাকে। তবুও গান্ধীজী পণ্ডিত জওহরলালকে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন—রাজেন্দ্রপ্রসাদকে নয়, বল্লভভাইকে নয়, এমনকি খাঁ আবদুল গফ্‌ফর খাঁকেও নয়। রাজাগোপালাচারী তাঁর কুটুম্ব। কুটুম্বও উত্তরাধিকারীর মর্য্যাদা পেলেন না।

একটা প্রশ্ন জাগে—যাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর এত বেশী মতের অনৈক্য তাঁকে তিনি সকলের মধ্য থেকে বেছে নিলেন কেন? এর উত্তর হচ্ছে—ভাবী জগত একদিন যে আদর্শের পূজারী হবে সেই আদর্শের জয়গান তিনি শুনতে পাচ্ছেন পণ্ডিতজীর কণ্ঠে। এই আদর্শ হোলো সোস্যালিজমের অর্থাৎ ধন-সাম্যবাদের আদর্শ। গান্ধীজী তাঁর The World

of Tomorrow প্রবন্ধে পরিষ্কার ক'রে বলেছেন, ভাবী জগতের প্রথম নীতি হবে নন্‌-ভায়োলেন্স—দ্বিতীয় মহানীতি হবে equal distribution অর্থাৎ সম্পদের উপরে সকলের সমান অধিকার। গান্ধীজীর মতে নন-ভায়োলেন্সের আদর্শকে স্বীকার করে নিলে equal distributionএর আদর্শকে স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। ধনের বৈষম্য রয়েছে যে সমাজে তার ভিত্তি শোষণের উপরে আর গান্ধীজীর মতে সমস্ত রকমের শোষণই হিংসা। যে মানুষ সকলকে আত্মবৎ দেখবে অর্থাৎ যে প্রেমের আদর্শকে জীবনে সত্য ক'রে তুলবে —সে কখনো এমন সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না যা মুষ্টিমেয় মানুষ কর্তৃক অগণিত মানুষকে শৃঙ্খলিত করে রাখবার অন্যায়কে কায়েম করে রাখতে চায়। এই জন্যই গান্ধীজী বলছেন—

"The contrast between the palaces of New Delhi and the miserable hovels of the poor labouring class cannot last one day in a free India..." (Constructive Programme by Gandhi P. 18.)

একদিকে নয়াদিল্লীর সৌধরাজী, আর একদিকে দরিদ্র শ্রমিকগণের কদর্য্য কুড়েঘরগুলি—এ দুয়ের মধ্যে আজ যে ব্যবধান রয়েছে—স্বাধীন ভারতবর্ষ এই ব্যবধানকে এক দিনের জন্যও বরদাস্ত করবে না।"

যে মানুষ সবাইকে ভালোবেসেছে সে যেমন আপনার

জীবনকে মুক্ত এবং পূর্ণ দেখতে চায়, অন্য সকলের জীবনকেও তেমনি মুক্ত এবং পূর্ণ দেখতে চায়। ক্যাপিট্যালিজম অর্থাৎ ধনকুবেরদের শাসন কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্র্যের মধ্যে, অজ্ঞতার মধ্যে বেঁধে রেখেছে। এইজন্য প্রেমের আদর্শের যিনি পূজারী তিনি কখনোই ক্যাপিট্যালিজমের সমর্থক হতে পারেন না। ধনের সমতা এবং দারিদ্র্যের অবসান তিনি চাইবেনই, কারণ দারিদ্র্য মানুষের জীবনকে পঙ্গু ক'রে দেয়। গান্ধীজী তাই এমন একটা জগতকে সৃষ্টি করবার জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন যার ভিত্তি প্রেমে অর্থাৎ যেখানে শোষণ নেই, ধনবৈষম্য নেই ; যেখানে জীবন ধারণের জন্য যা প্রয়োজন তার বেশী সম্পদের উপরে কেউ দাবী করতে পারবে না। গান্ধীজীর তের দফা গঠনমূলক কার্য্যতালিকার মধ্যে তাই Working for Economic Equalityকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য্য সম্পর্কে গান্ধীজী লিখেছেন,

A nonviolent system of government is clearly an impossibility so long as the wide gulf between the rich and the hungry millions persists. (Constructive Programme by Gandhi P. 18.

"এক দিকে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত নরনারী—আর একদিকে মুষ্টিমেয় ধনকুবের—এ দুয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান বিদ্যমান থাকতে অহিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র অসম্ভব।

এই যে সোস্যালিজমের যুগবাণী, এই যুগবাণীই পণ্ডিত জওহরলালের বাণীর বৈশিষ্ট্য. অর্থাৎ তিনিই গান্ধীজীর প্রেমের আদর্শকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন। আমরা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অথবা বল্লভভাইয়ের কণ্ঠেও প্রেমের আদর্শের জয়গান শুনছি—কিন্তু ক্যাপিট্যালিজমের বিরুদ্ধে পণ্ডিত জওহরলাল যে অভিযান সুরু করেছেন—বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের, আচার্য্য কৃপালানীর অথবা আবদুল গফ্ফর খাঁর সাধনায় সেই অভিযানের তেমন রুদ্ররূপ আমরা দেখতে পাইনে। নন্-ভায়োলেন্সের আদর্শকে যদি মনে প্রাণে বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ ক'রে থাকি তবে অর্থনীতির ক্ষেত্রেও প্রেমের আদর্শকে জয়যুক্ত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হবো, যে সমাজ শোষণকে প্রশ্রয় দেয় তাকে কখনোই স্বীকার করবো না, ধনবৈষম্যের আধিপত্যকে নির্ম্মূল ক'রে সমাজের সম্পদের উপর সকলের সমান অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবন পণ করবো। পণ্ডিতজীকে আপনার উত্তরাধিকারী ব'লে গান্ধীজী যে ঘোষণা করলেন তার কারণ পণ্ডিতজীর মধ্যে গান্ধীজী দেখলেন তাঁর নন্-ভায়োলেন্সের আদর্শের যথার্থ জয়। যে ভাবী জগতের স্বপ্ন দেখছেন গান্ধী তারই সুর তিনি শুনতে পেয়েছেন জওহরলালের রুদ্রবীণায়। সোস্যালিজম হচ্ছে যুগধর্ম্ম। সোস্যালিজমের আদর্শকে জয়যুক্ত করবার সাধনা নেই যার জীবনে, বাণী

নেই যার কণ্ঠে বর্ত্তমান ভারতের নেতা হবার যোগ্যতা নেই তার, ভবিষ্যতের ভারত তার নেতৃত্বকে কখনো স্বীকার করবে না। সোস্যালিজমের মধ্যে রয়েছে একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিমা। যাঁরা বলেন, শুধু চরকা চালিয়ে, মরা গরুর চামড়ায় জুতা বানিয়ে, হাতের তৈরী কাগজ দিয়ে, যাঁতা-পেশা আটা, ঘানির তেল এবং ঢেঁকী ছাঁটা চা'লকে আশ্রয় ক'রে সমাজ থেকে দারিদ্র্যকে নির্ব্বাসিত করবেন—তাঁদের উদ্দেশ্য খুবই সাধু, কিন্তু দৃষ্টি খুব স্বচ্ছ নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ এবং সম্পদ সৃষ্টির উপায়গুলির উপরে সর্ব্বসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে সমাজ থেকে দারিদ্র্য নির্ব্বাসিত করা কখনোই সম্ভব নয়। পণ্ডিত জওহরলাল এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিমায় ঐশ্বর্য্যশালী। তিনি যে শুধু সর্ব্বহারাদের ভালোবেসেছেন তা নয়, সেই ভালোবাসা জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সর্ব্বহারাদের মুক্তি আসবে কোন্ পথে তারও তিনি সন্ধান পেয়েছেন। জ্ঞান ও প্রেমের এই মণিকাঞ্চন যোগ দুর্লভ। পণ্ডিতজীর সাধনায় জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের যোগ ঘটেছে। সর্ব্বহারাদের মঙ্গলের বেদীমূলে জীবনকে উৎসর্গ করবার প্রেরণা দিয়েছে প্রেম। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসানের পথে ধনসাম্যকে অশ্রয় ক'রে সর্ব্বহারারা একদা শৃঙ্খলমুক্ত হবে—এই যে দৃষ্টি এ দৃষ্টি জ্ঞানেরই দৃষ্টি।

পণ্ডিত জওহরলালের প্রতিভার মধ্যে গান্ধী আর একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। জওহরলাল সোস্যালিষ্ট হলেও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত তাঁর জ্ঞানদীপ্ত মন। তিনি কোনো থিয়োরীর বুনো হাঁসের পিছনে ছোটেন না—বাস্তবের দাবীকে স্বীকার ক'রে চলবার ক্ষমতা আছে তাঁর। এই জন্যই গান্ধীজীর সঙ্গে মতের এত পার্থক্য সত্ত্বেও জওহরলাল তাঁর নেতৃত্বকে পঙ্গু করবার চেষ্টা কখনো করেননি। বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি দেখেছেন, বিপ্লব কারও একচেটিয়া নয়। তাকে জয়যুক্ত করতে হলে সমস্ত রকমের শক্তিকে কাজে লাগানো দরকার। গান্ধীজীর আস্তিক্যবাদ অথবা 'ট্রাস্টিশিপ' এর থিয়োরী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গিমায় অযৌক্তিক ব'লে প্রতিপন্ন হ'তে পারে, কিন্তু গান্ধীজী যে সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড বিরোধী এতে কোনো সন্দেহ নাই। সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাতে না পারলে রাষ্ট্রীয় শক্তি হাতে না এলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি যে অসম্ভব এতেও কোনো সন্দেহ নেই। পণ্ডিতজী তাই গান্ধীজীর মতো সাম্রাজ্যবাদের এত বড়ো শত্রুকে আঘাত তো দিলেনই না, নতশিরে তাঁর নেতৃত্বকে স্বীকার ক'রে নিলেন। এই নেতৃত্ব স্বীকার চৈনিক কমিউনিষ্টগণ কর্তৃক চিয়াং-কাই-শেকের নেতৃত্ব স্বীকারের কথা মনে করিয়ে দেয়। যে সত্যিকারের নেতা সে সমস্ত শক্তিকে ব্যবহার করবে বিপ্লবকে জয়ী

করবার জন্য। বিপ্লবের অনুকূল যে শক্তি তাকে কখনো সে উপেক্ষা করতে পারে না, আঘাত দেবে না।

বাস্তববাদী ব'লেই পণ্ডিত জওহরলাল যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে কুটিরশিল্পকেও স্বীকার করতে পারলেন। তিনি একজন খাঁটি প্রগতিবাদী; আর সত্যিকারের প্রগতিবাদী যে, সে জানে, কোন একটা দিক লক্ষ্য ক'রে সেই দিকে অনবরত আগিয়ে যাওয়াটাই সব সময়ে প্রগতির লক্ষণ নয়। একটা জায়গা আছে যেখানে থামতেই হয়। কোন্ খানে থামতে হবে এ বোধ যার নেই সে প্রগতির নামে বিপত্তি ঘটিয়ে বসবে। যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজন আছে—সে প্রয়োজনের সীমাও আছে। কাঠের চেয়ার হয়, বেঞ্চিও হয়, আল্‌মারী হয়, নৌকা হয়, কিন্তু তাই ব'লে কাঠের ছুরি হয় না, ক্ষুর হয় না, জামা হয় না, টুপিও হয় না। সব জিনিষের সম্পর্কেই এই কথা খাটে। প্রয়োজন যতই হোক্ একটা না একটা জায়গায় আমাদের থামতেই হয়। কুটির শিল্পেরও প্রয়োজন আছে—সেই প্রয়োজনের সীমাও আছে। কুটির শিল্পকে আশ্রয় ক'রে আমরা কাগজ বানাতে পারি, কাপড় বানাতে পারি, জুতাও বানাতে পারি, কিন্তু জাহাজ বানাতে পারি নে। পণ্ডিত জওহরলালের আছে একটা স্বচ্ছ দৃষ্টি—আর এই দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছেন, কোনো-কিছুরই গোঁড়ামি ভাল নয়। এইজন্য তিনি

গান্ধীবাদীদের গোঁড়ামিকে একদিকে যেমন সমর্থন করেন না; সোস্যালিষ্টদের গোঁড়ামিকেও তেমনি তিনি স্বীকার করেন না। সব রকমের গোঁড়ামিরই তিনি একজন প্রকাণ্ড শত্রু। তিনি একজন বাস্তববাদী। এইজন্য ভারতবর্ষকে রাতারাতি রাশিয়ার একটা দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত করবার কোন ঝোঁক নেই তাঁর। ভারতবর্ষ যে ভারতবর্ষ—রাশিয়া নয়, এই সহজ বোধকে কোনো থিয়োরী দিয়ে আবিল করতে তিনি আদৌ প্রস্তুত নন। মস্কোর প্রতি অনুরাগ তাঁর মনে যথেষ্ট আছে কিন্তু ওয়ার্দ্ধার মূল্যই বা কম কি? পণ্ডিতজী মস্কো এবং ওয়ার্দ্ধা উভয়কেই শ্রদ্ধার আসন দিয়েছেন জীবনে।

মার্কসকে স্বীকার করতে গিয়ে গান্ধীজীকে অস্বীকার করেন নি—গান্ধীজীকে স্বীকার করতে গিয়ে মার্কসকেও অস্বীকার করেন নি, আন্তর্জ্জাতিকতার বেদীমূলে আত্ম-নিবেদন করতে গিয়ে জাতীয়তাকে ছোট ক'রে দেখেন নি, জাতীয়তাবাদী হতে গিয়ে আন্তর্জ্জাতিকতার আদর্শকেও আঘাত দেন নি। বাস্তবকে স্বীকার ক'রে নেবার এই যে ক্ষমতা, কোনো একটা থিয়োরীর দ্বারা শৃঙ্খলিত না হবার এই যে শক্তি—এই শক্তিই পণ্ডিতজীকে নেতার আসন অধিকার করবার যোগ্য ক'রে তুলেছে। গান্ধীজীর মৃত্যুর পরে তাঁর শূন্য আসনকে পূর্ণ করবার যোগ্যতা যদি

কারও থাকে সে পণ্ডিত জওহরলালের। মার্কসবাদ অথবা গান্ধীবাদ—কোনো বাদেরই সঙ্কীর্ণতা তাঁর চিত্তকে শৃঙ্খলিত করতে পারেনি। নবযুগের বাণী যাঁর কণ্ঠে—স্বপ্ন আর বাস্তবকে মিলিয়েছেন যিনি—নম্রতা এবং তেজস্বিতা একই সঙ্গে যাঁর চরিত্রের ভূষণ—তাঁকে যে গান্ধী উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করবেন-এতে আর বৈচিত্র্য কি ?*

*যুগান্তর পত্রিকা হইতে পুণর্মুদ্রিত

সোস্যালিষ্ট গান্ধী

গান্ধীজী সোস্যালিষ্ট কি সোস্যালিষ্ট্ নন—তার বিচার করতে হোলে সোস্যালিজম্ বল্‌তে মোটামুটি কি বোঝায় তা জানা দরকার। সোস্যালিজমের ভিত্তি তুটো সত্যের উপরে, যাদের উপরে কোনো কথা বলা চলে না। প্রথম সত্য হচ্ছে জগৎ জুড়ে কোটী কোটী মানুষ অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীবন যাপন করছে। অনশনের তুঃখ থেকে তাদের মুক্ত করাই হচ্ছে, প্রথম কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় সত্য হচ্ছে, ব্যষ্টির দয়া দিয়ে তু'এক-জনের চেষ্টায় কোটী কোটি অনশনক্লিষ্ট মানুষকে দৈন্য থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। সমষ্টিগত চেষ্টা চাই। সমাজ-জীবনকে ঢেলে সাজতে হবে।

সোস্যালিজমের ভিত্তি যে তুটো সত্যের উপরে—গান্ধীজী তাদের স্বীকার করেন। তিনি জানেন—জাহাজ যেখানে ডুবছে সেখানে প্রথম প্রয়োজন জীবনতরীর ব্যবস্থা করা, বাড়ী যেখানে পুড়ছে সেখানে আগে দরকার আগুন নেবানোর জন্য বাল্‌তি যোগাড় করা; শতকরা পঁচানব্বুই জন লোক যেখানে অনশনে শুকিয়ে মরছে সেখানে সব কাজ ফেলে নিরন্নদের জন্য কাজের এবং অন্নের ব্যবস্থা করাই হচ্ছে প্রথম কর্ত্তব্য। সবরমতীর ঋষি জনতা থেকে দূরে কোনো নিভৃত আশ্রমে

ধ্যান-ধারণার মধ্যে ডুবে থাকতে পারলেন না কেন ? সেবা-গ্রামে দর্শনের নানাবিধ জটিলতত্ত্বের সমাধানে তিনি তো রত থাকতে পারতেন। তিনি ভক্ত। চৈতন্য মহাপ্রভুর মতো নাম-কীর্ত্তন-রসেই বা ডুবে থাকলেন না কেন ? এর উত্তর হচ্ছে যেখানে কোটী কোটী মানুষ না খেয়ে রয়েছে সেখানকার প্রধান সমস্যা দর্শনের নয়, আর্টেরও নয়, অন্নের সমস্যাই হচ্ছে সেখানকার প্রধান সমস্যা। আগে মানুষকে বাঁচতে দাও। তারপরে দর্শনের কথা, আর্টের কথা, ভাগবত জীবনের কথা, অধ্যাত্মরাজ্যের গূঢ় সব রহস্যের কথা। গান্ধীজী দেখলেন ভারতের সাতলক্ষ গ্রাম শ্মশানের সামিল আর সেই শ্মশানে যারা বাস করে তারা জীবন্ত নরকঙ্কাল। সকলের আগে দরকার তাদের অন্ন দিয়ে বাঁচানো। আগে তারা বাঁচুক—তার পর তারা ভাগবত জীবনের কথা শুনবে, আর্টের ইন্দ্রলোকে প্রবেশ ক'রে জীবনকে ধন্য করবার অবসর পাবে। গান্ধী বললেন রবীন্দ্রনাথকে, 'তুলে রাখো তোমার বীণা। ভারতবর্ষ জতুগৃহের মতো জ্বলছে। দারিদ্র্যের অগ্নিতাপে সর্ব্বত্র মনুষ্যত্ব শুকিয়ে যাচ্ছে। বীণা রেখে বালতি ধর। অগ্নি আগে নির্ব্বাপিত কর। আগে মানুষ খেয়ে প'রে বাঁচুক। তখন তোমার বাঁশি বাজানোর সময় আসবে।' আমাদের স্বপ্ন-বিলাসী মনকে জোরে নাড়া দিয়ে গান্ধী ঘোষণা করলেন—যেখানে জাতকে জাত উপবাসী সেখানে ভগবান আসতে

সাহস করেন কেবল একটী মূর্ত্তিতে—অন্নপূর্ণার কল্যাণময়ী মূর্ত্তিতে। উপবাসী জাতির পক্ষে অন্ন ছাড়া আর কিছুকে মূল্য দেওয়া অসম্ভব। অতএব কোটী কোটী ক্ষুধার্ত্তের জন্য অন্নের ব্যবস্থা করা চাই সকলের আগে। গান্ধী লিখলেন,

When all about me are dying for want of food, the only occupation permissible for me is to feed the hungry.

"আমার চারপাশে সবাই যখন না খেয়ে মরছে তখন শুধু একটা কাজ করবার আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে আর সেই কাজটী হচ্ছে ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেওয়া।" সোস্যালিজ্‌মের প্রথম সত্যকে গান্ধীজী জোরের সঙ্গেই স্বীকার করেছেন।

এইবার আসে সোস্যালিজমের দ্বিতীয় সত্যের কথা অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষের দয়াকে আশ্রয় করে উপবাসী জাতিকে অন্নের প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাঁচিয়া তোলা সম্ভব নয়। একাজ সম্ভব সকলের সমবেত চেষ্টায়। গান্ধীজী দয়ার দিক দিয়েও গেলেন না। সারা জাত যেখানে উপবাসী সেখানে দু'দশ জন ধন-কুবের গোটাকতক অন্নসত্র খুলে দিয়ে ক'জনের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করতে পারে? গ্রামের পর গ্রাম যেখানে হাঁসপাতাল হ'য়ে রয়েছে সেখানে বড়লোকদের চাঁদায় তৈরী দু'দশটা দাতব্য চিকিৎসালয় দিয়ে কি হতে পারে? গান্ধীজী তাই গরীবদের উপকার করবার জন্য চাঁদার খাতাকে তাঁর সম্বল

করলেন না। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের মতো ঘুরে ঘুরে বিপন্ন লোকদের সাহায্য করাও তাঁর কাছে খুব সমীচীন বোধ হোলো না। একদল লোক উপর থেকে ক্রমাগত সাহায্য ক'রে যাবে আর সহস্র সহস্র হতভাগ্য দীনদরিদ্র ধূলায় দাঁড়িয়ে সেই দয়ার দান ক্রমাগত হাত পেতে গ্রহণ ক'রে চলবে—এ কেমন কথা? সমাজে এমন একটা অবস্থা কি আনা যায় না যেখানে দারিদ্র্যই থাকবে না? আমাদের দৃষ্টির মধ্যে আবিলতা আছে—চিন্তার মধ্যে জড়তা আছে যার জন্য সমাজে দীনের এই প্রাচুর্য্য। গান্ধীজী দেখলেন লক্ষ লক্ষ লোক যে খেতে পাচ্ছে না তার কারণ তারা বেকার। অলস মুহূর্ত্তগুলিকে কাজে লাগাতে পারে এমন কর্ম্মেরই তাদের অভাব। কাজ পেলে কাজ ক'রে তারা যে মজুরি পাবে তাই দিয়ে জীবিকার একটা পন্থা হ'তে পারে। গান্ধী শ্মশানের নীরবতা ভাঙলেন চরকার গানে। গ'ড়ে তুললেন নিখিল-ভারত-কাটুনি সংঘ। গান্ধীজী লিখলেন,

I have not conceived my mission to be that of a knight-errant wandering everywhere to deliver people from difficult situations. My humble occupation has been to show people how they can solve their own difficulties.

"পুরাকালের নাইটদের মতো আমার কাজ নয় ঘুরে ঘুরে বিপন্ন

লোকদের সাহায্য ক'রে বেড়ানো। আমার ক্ষুদ্র ব্রত হচ্ছে কেমন ক'রে লোকে নিজের মুস্কিল নিজেরাই আসান করতে পারে তারই পথ প্রদর্শন করা।"

সত্যিকারের যে সোস্যালিষ্ট তার কোনো আস্থা নেই 'চ্যারিটি'র উপরে। দয়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্তকে কখনো চিরকালের জন্য ক্ষুধার যাতনা থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। ভিক্ষা দিয়ে মানুষকে আমরা শুধু পরমুখাপেক্ষী ক'রে তুলি। গান্ধীজী মানুষকে পরমুখাপেক্ষী করতে চান না, তাকে করে তুলতে চান আত্মনির্ভরশীল। এই জন্য 'দীন দেখিলে দয়া কর'—এই রকমের নীতিবাক্যকে গান্ধীজী একেবারেই পছন্দ করেন না, ভিক্ষা দেওয়ার তিনি ঘোর বিরোধী। তিনি চান দেশে দীন ব'লে একজনও থাকবে না। দেশে দীন যদি কেউ না থাকে তবে ভিক্ষা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, দরিদ্রকে দয়া করার কথা শিশু শিক্ষার পাতায় একটা অর্থহীন নীতিবাক্য হ'য়ে থাকবে। তাঁর পরিকল্পিত স্বরাজে অভাব ব'লে তো কিছু থাকবে না—সুতরাং কে কার কাছে ভিক্ষা চাইবে? তিনি লিখছেন,

"আমার পরিকল্পিত স্বরাজে দীনতম ভারতবাসীও প্রচুর পরিমাণে খেতে পাবে দুধ আর ঘি, শাকসব্জী আর ফলফুলুরি। প্রতিটী নর এবং নারী বাস করবে সুন্দর বাড়ীতে, শরীরকে সুস্থ এবং কার্য্যক্ষম রাখবার মতো স্বাস্থ্য সম্মত আহার্য্য তারা পাবে।"

কিন্তু চারিদিকে দীনের এত প্রাচুর্য্য কেন? গ্রাম্য শিল্প-গুলি ধ্বংস হ'য়ে গেছে। লোকেরা পল্লীতে কোনো কাজ পায় না। সহরের কারখানায় আসে ডান হাতের পরিশ্রম বিক্রী করতে যে কোনো মূল্যে। মালিকেরা যত বেশী পারে তাদের দিয়ে খাটিয়ে নেয়, মজুরি দেবার বেলায় যত কম পারে দেয়। গান্ধীজী হতভাগ্য সর্ব্বহারাদের মুক্ত করতে চান ধনীদের দ্বারে যে কোনো মূল্যে নিজেদের পরিশ্রমকে বিক্রয় করবার এই বিড়ম্বনা থেকে। গ্রামের লোকেরা ধনকুবেরদের দ্বারে না গিয়ে গ্রামে থেকেই উপার্জ্জন ক'রে যাতে নিজেদের অভাব নিজেরা মিটিয়ে নিতে পারে তার জন্যই তো মৃতপ্রায় পল্লী-শিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে তুলবার এত প্রাণপণ চেষ্টা। তিনি লক্ষ লক্ষ দরিদ্রকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে চান আর শোষণই তো হিংসা। চরকার উপরে এত যে জোর সে আমাদের মনকে গ্রামমুখী করবার উদ্দেশ্য নিয়ে, ধনীদের শোষণের হাত থেকে সর্ব্বহারাদিগকে মুক্ত করবার নিমিত্ত, দেশে ভিক্ষুক ব'লে, দীন ব'লে যাতে কেউ না থাকে তারই জন্যে। গান্ধী লিখছেন,

I shall be satisfied if at my death it could be said of me that I had devoted the best part of my life to showing the way to become self-reliant and cultivate the capacity to defend oneself under every conceivable circumstance. (Harijan, June 28, 1942.

"আমার জীবনের সার অংশ আমি নিয়োগ করেছি কেমন ক'রে আত্মনির্ভরশীল এবং সর্ব্ব অবস্থায় আত্মরক্ষায় সক্ষম হওয়া যায় তার পথ দেখাবার জন্য। শোক সভায় আমার সম্পর্কে এইটুকু বললেই আমি খুসী হবো।"

গান্ধী দরিদ্রের শত্রু হ'লে খাওয়া-পরার দিক থেকে যাতে তারা কোনো দিনই আত্ম-নির্ভরশীল হতে না পারে সেই চেষ্টাই করতেন। সম্পদ উৎপন্ন করতে হ'লে কেবল নোটের তাড়ায় কুলায় না ; জমিতে খাটবার জন্য দলে দলে সহায়-সম্বলহীন মজুর চাই। জমি আছে কিন্তু সেখানে খাটবার জন্য মজুর নেই—এমন অবস্থায় জমি মর্ত্ত্যলোকে থাকাও যা, চন্দ্র-লোকে থাকাও তাই। সুতরাং টাকা করার জন্য মালিকদের মজুর সংগ্রহ করতে হবে। তাদের পরিশ্রমকে অবলম্বন ক'রে তবেই ধনী হওয়া সম্ভব। সস্তায় মজুর পাওয়া চাই—নইলে লাভের অংশ চলে যাবে। দরিদ্রের দারিদ্র্যের উপরেই তো ধনীদের ঐশ্বর্য্য। কিন্তু মজুররা এত অল্প মজুরিতে খাটবে কেন? কারণ ঘরে তাদের কিছুই খাবার নেই। তারা নিঃসম্বল ব'লেই তাদের শোষণ করবার এত সুবিধা। ঘরে খাওয়া-পরার সম্বল থাকলে তারা নামমাত্র মজুরিতে কল-বক-রাক্ষসের গর্ভে ঢুকতে যাবে কেন? গান্ধী কুটীর-শিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে তুলে গ্রামের লোকগুলিকে খাওয়া-পরার দিক দিয়ে পরমুখাপেক্ষিতার বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত করতে চান। ভাতের

জন্ম কাপড়ের জন্য পরমুখাপেক্ষী হতে তারা যদি বাধ্য না হয় —তবে শোষণ করার পালাও শেষ হ'য়ে যায়। শোষণই তো হিংসা আর গান্ধীজী হিংসার একান্ত বিরোধী। হিংসা বন্ধ করতে হ'লে শোষণ বন্ধ করতে হবে, শোষণ বন্ধ করতে হ'লে মানুষগুলি যাতে উদরান্নের ব্যবস্থার জন্য ধনীদের দ্বারস্থ না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে, সে ব্যবস্থা করতে হলে গ্রামের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যাতে গ্রামেই উৎপন্ন হয় সে ব্যবস্থা করা চাই। এইজন্যই তো চরকার উপরে এত জোর। গ্রাম্য শিল্পগুলিকে পুনর্জীবন দান ক'রে গান্ধীজী আনতে চান এমন একটা নূতনতর সমাজ-ব্যবস্থা যার ভিত্তি অহিংসায় —লোভে নয়, শোষণে নয়।

"You can not build non-violence on a factory civilisation, but it can be built on self-contained villages. Rural economy as I have conceived it eschews exploitation altogether and exploitation is the essence of violence",

কিন্তু দেশে বড়ো বড়ো যন্ত্রশিল্পের স্থানও তো থাকবে বিদ্যুত অথবা জাহাজ তৈরীর জন্য। কিন্তু সেগুলির মালিক হবে জাতি। করাচী কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি প্রস্তাব হচ্ছে nationalisation of key industries প্রধান প্রধান শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা

হবে। এ প্রস্তাব গান্ধীজী নিজেই করেছিলেন। শোষণ করবার সুযোগ পাছে মিলে যায়। গান্ধীজী তাই শুধু চরকা কাটার কথা ব'লে নিরস্ত হলেন না। যারা তাঁর সিপাহী হ'য়ে গ্রামে গ্রামে যাবে তারা গ্রামবাসীদের শেখাবে নিজেদের শক্তি ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে, ভীরুতা পরিহার ক'রে অন্যায় ও অবিচারকে বাধা দিতে, যারা তাদের শোষণ করতে চাইবে তাদের সঙ্গে অসহযোগ করতে।

"Exploitation of the poor can be extinguished not by effecting destruction of a few millionaires, but by removing the ignorance of the poor and teaching them to non-cooperate with the exploiters."

(Harijan, 28.7.40.)

"দরিদ্রকে শোষণ করার যে পালা চলছে তা বন্ধ করবার উপায় কতকগুলি লাখোপতিকে খতম করা নয়। সে উপায় সর্ব্বহারাদের অজ্ঞতা দূর করা, যারা তাদের শোষণ করছে তাদের সঙ্গে অসহযোগ করতে শেখানো।"

গান্ধীজী তো কেবল সুতা কাটতে বলছেন না, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলছেন সুতাকাটার ভিতর দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকগণকে শিক্ষিত, সংঘবদ্ধ, শক্তিমান, দেশপ্রেমিক এবং সাহসী ক'রে তুলতে। সেদিনও তিনি ওয়ার্দ্ধায় খাদিকর্ম্মীদের লক্ষ্য ক'রে বললেন,

"আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সুতা কাটতেন, তাঁত বুনতেন, নিজেদের কাপড় নিজেরাই তৈরী করতেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন শুধুই কাটুনি, শুধুই জোলা। পরিশ্রম করতেন হয় উদরান্নের জন্য নয় তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য। তাঁরা এমন কিছু রেখে যান নি যার অনুকরণ আমরা করতে পারি। সেই দাসত্বের জন্য আমাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—গোলামি নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে হবে। তাদের মেহনতের মধ্যে গ্লানির কিছু থাকতো না যদি তার পিছনে থাকতো জ্ঞান, মনে থাকতো দেশকে স্বাধীন করবার কামনা, চিত্তে থাকতো—যে আমাকে ক্রীতদাস ক'রে রেখেছে তার কাছে নতজানু হবো না—এই সংকল্প, হৃদয়ে থাকতো সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ। খদ্দরশিল্পের পুনরুদ্ধার মানে এই সব গুণের অধিকারী হওয়া। এই গুণ আমাদের দান করবে নবজীবনের অমৃত।"

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি গান্ধীজী কেবল 'ট্রাস্টিশিপ'এর কথা বলেন না, উদার হবার জন্য ধনীদের কাছে আবেদন জানিয়ে ক্ষান্ত থাকার মানুষ তিনি নন। মার্ক্সের মতো তিনিও বল্‌ছেন, 'কৃষক ও শ্রমিকেরা, তোমরা আলাদা আলাদা হ'য়ে থেকো না, নিজেদের মধ্যে যে শক্তি রয়েছে তার সন্ধান লাভ কর, আপনাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হও, সংঘবদ্ধ হও। যে শৃঙ্খল তোমাদের বেঁধে রেখেছে তাকে আঁকড়ে থেকো না, যারা তোমাদের গোলাম ক'রে রাখতে চায় তাদের সঙ্গে সহযোগিতা কোরো না।' যারা শুধু 'ট্রাস্টিশিপে'র কথা ব'লে গান্ধীজীকে বিদ্রূপ করে তারা সত্যের আধখানা বলে, আর অর্দ্ধসত্যের মতো এমন কদর্য্য মিথ্যা আর নেই।

একজন মানুষকে পুঁজিবাদের সমর্থক বললে তাকে আর অহিংসার সমর্থক বলা চলে না। পুঁজিবাদের ভিত্তি লোভে, শোষণে। পুঁজিবাদী মানুষের জীবনকে মূল্য দেয় না—তার কাছে মানুষের জীবনের চাইতে টাকার মূল্য অনেক বেশী। তাই পুঁজিবাদীরা টাকার জন্য মানুষকে গরু-ঘোড়ার মতো খাটাতে দ্বিধা করে না। তাদের দারিদ্র্যের উপরে গ'ড়ে তুল্‌ছে নিজেদের ঐশ্বর্য্য। এই রকম ক'রে মানুষকে শোষণ করাই হচ্ছে আসল হিংসা—গান্ধীজীর নিজের ভাষায় exploitation is the essence of violence. একজনকে চড় মারলে যেমন অহিংসার ব্যতিক্রম ঘটে, একজনকে নিজের স্বার্থের জন্য গরু-ঘোড়ার মত খাটালেও তেমনি অহিংসার ব্যতিক্রম ঘটে। কাউকে গালিগালাজ করা যেমন হিংসা—কাউকে শোষণ করাও তেমনি হিংসা। যেখানে প্রেম আছে অন্তরে, সেখানে মানুষের জীবনকে অবহেলা ক'রে টাকাকে সবখানি মূল্য দেওয়া অসম্ভব। শোষণ যদি হিংসা হয় তবে পুঁজিবাদের ভিত্তি হিংসায়—কারণ পুঁজিবাদ দাঁড়িয়ে আছে শোষণের উপরে। দরিদ্রকে দরিদ্রতর ক'রে ধনী আরও ধনী হ'য়ে উঠ্‌ছে। গান্ধী হিংসাকে সমর্থন করেন না—সেইজন্য শোষণকে সমর্থন করেন না—সেইজন্য পুঁজিবাদকেও সমর্থন করেন না।

যেখানে প্রেম আছে সেখানে বঞ্চনা নেই। ছেলেকে

বঞ্চিত ক'রে মা কখনো ভালো জিনিষ খেতে পারে না। আগে ছেলের মুখে দেয়, পরে নিজে খায়। ছেলে শীতে তুর্‌তুর্‌ ক'রে কাঁপছে—আর বাবা গরম কাপড়-চোপড় প'রে উদাসীনভাবে সেই দৃশ্য দেখছে—এমন ব্যাপার কদাচিৎ ঘটতে পারে। বাবা ছেলেকে ভালোবাসে আর যাকে আমরা ভাল-বাসি, তার দুঃখকে আমরা নিজেরই দুঃখ ব'লে অনুভব করি। বাবা শীতার্ত্ত ছেলের দুঃখকে নিজের মধ্যে অনুভব করে আর সেইজন্য নিজের গরম কাপড় ছেলের অঙ্গে জড়িয়ে দেয়। ভালোবাসলে কেবল আহা উহুঃ ক'রে তো আমরা ক্ষান্ত থাকতে পারি নে। কাজের মধ্যে প্রেম আপনাকে প্রকাশ করে। গান্ধী ভারতবর্ষের কোটী কোটী মানুষকে ভালো-বেসেছেন। ভালোবেসেছেন—একথা যদি সত্য হয় তবে এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কখনো তিনি সমর্থন করতে পারেন না যা হাজার হাজার মানুষকে দারিদ্র্যের মধ্যে পঙ্গু ক'রে রেখেছে। যেখানে ভালোবাসা সেখানে নিজের জন্য জীবনের যে পূর্ণতা দাবী করি প্রিয়জনের জন্যও জীবনের সেই পূর্ণতা দাবী করি। দয়া ক'রে, ভিক্ষা দিয়ে যেখানে কর্ত্তব্য শেষ করি সেখানে আর যাই থাক, প্রেম নেই। ভিখারীর ছেলে দ্বারে এসে দাঁড়ালে তাকে দুটো পয়সা দিয়ে কর্ত্তব্য শেষ করি। নিজের ছেলেকে গোটা কয়েক পয়সা দিয়ে তো কর্ত্তব্য শেষ করতে পারি নে। তাকে ভালো কাপড়-চোপড়

কিনে দিই, ইস্কুলে পাঠাই লেখাপড়া শিখবার জন্য, অসুখ করলে ডাক্তার ডাকি—তার জীবনকে আমি সব দিক থেকে পূর্ণ ক'রে তুলতে চাই। ছেলেকে আমি যে ভালোবাসি। গান্ধী ভারতবর্ষের কোটী কোটী মানুষকে আত্মবৎ ভালোবাসেন। তাই তাদের জীবনকে দেখতে চান মুক্ত এবং পূর্ণ। সেটা কখনো সম্ভব নয় যদি তারা দরিদ্র থেকে যায়। দারিদ্র্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ কদাচিৎ সম্ভব। এইজন্য গান্ধী দারিদ্র্যকে সমাজ থেকে নিঃশেষ করতে চান। তিনি যে সমাজের পরিকল্পনা করেছেন, সেখানে দৈন্যের বিভীষিকা নেই। "যত কাল পর্য্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণ এবং মুষ্টিমেয় ধনকুবের—এই উভয়ের মধ্যে ধনগত বৈষম্যের ব্যবধান থাকবে ততদিন অহিংসার ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থা অসম্ভব।" এই তো গান্ধীর কথা। একজন মানুষকে যে মুহূর্ত্তে অহিংসার পূজারী অর্থাৎ বৈষ্ণব বলছি সেই মুহূর্ত্তে এই কথাই স্বীকার করছি যে সেই মানুষটী আর সবাইকে আত্মবৎ ভালোবাসে। যেখানে অন্যকে আমরা নিজের মত ভালোবাসি সেখানে নিজের জন্য যা কামনা করি, অন্যের জন্যও তাই কামনা করি। আমরা নিজেকে মুক্ত এবং পূর্ণ দেখতে চাই। এইজন্য আমাদের যারা প্রিয়জন তাদের জীবনকেও মুক্ত এবং পূর্ণ দেখতে চাই। গান্ধীকে যদি বৈষ্ণব বলি, অহিংসার পূজারী বলি তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে তিনি সবাইকে আত্মবৎ ভালোবাসেন।

গান্ধী ভারতবর্ষের কোটী কোটী মানুষকে ভালোবাসেন একথা স্বীকার করলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে তিনি ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের কোটী কোটী মানুষের জীবনকে মুক্ত এবং পূর্ণ ক'রে তুলতে চান। তা সম্ভব যদি সম্পদের উপরে সকলের সমান অধিকার হয়। এইজন্যই গান্ধী আয়ের সমতার এত পক্ষপাতী।

বিভীষিকার কবলে বাঙালী

সীতারামিয়ার পরাজয় আমারই পরাজয়—গান্ধীজীর এই কথাটী অনেক বাঙালীর অন্তরে ক্রোধের ঝড় তুলেছে। তাঁরা ব'লে থাকেন—গান্ধী বাঙালীকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না—তাই সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে তবে ক্ষান্ত হ'লেন। সুভাষচন্দ্রকে তাড়ানো যদি গান্ধীর বাঙালী-বিদ্বেষের পরিচয় হয় তবে বল্‌তে হবে তিনি পার্শী-বিদ্বেষী, কারণ তিনি নরীম্যানকে তাড়িয়েছেন। তিনি মারাঠী-বিদ্বেষীও, কারণ তিনি ডাঃ খারেকেও তাড়ানোর হেতু। তিনি যে-কংগ্রেসের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা তার মধ্যে কুটুম্ব রাজাগোপালাচারীরও আজ স্থান নেই। তবে কি বলবো তিনি মাদ্রাজী-বিদ্বেষীও? গান্ধী সুভাষচন্দ্রকে তাড়িয়েছেন; সুভাষ বাঙালী; অতএব গান্ধী বাঙালী-বিদ্বেষী। আমাদের যুক্তি যদি এই পথে চলে তবে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হবে গান্ধীজী মাদ্রাজী-বিদ্বেষী, মারাঠী-বিদ্বেষী, পার্শী-বিদ্বেষী। কিন্তু সেকথা তো আমরা বলিনে—মাদ্রাজীরা, মারাঠীরা, পার্শীরাও সেকথা বলে না। আমরা শুধু বলি গান্ধী বাঙালী-বিদ্বেষী। তিনি মারাঠী-বিদ্বেষী, মাদ্রাজী-বিদ্বেষী, পার্শী-বিদ্বেষী—একথা বললে লোকে পাগল বলবে; তাই চুপ ক'রে যাই। আর একটা

কথা। সুভাষচন্দ্রকে তাড়িয়ে গান্ধী যদি বাঙালী-বিদ্বেষের পরিচয় দিয়ে থাকেন তবে সুভাষচন্দ্রও কংগ্রেসের সভাপতির পদে আসীন থাকবার কালে ডাঃ খারেকে তাড়িয়ে মারাঠী-বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছেন।—কিন্তু একথা কি কোন সুভাষ-ভক্ত স্বীকার করবেন? সুভাষকে তাড়ানো নিয়ে এত কথা ওঠে। কিন্তু খারেকে তাড়িয়ে সুভাষচন্দ্র খবরের কাগজে প্রকাণ্ড বিবৃতি বার করলেন। তা নিয়ে তো কোনো কথা ওঠে না। যেহেতু সেটা সুভাষ করেছিলেন সেই হেতুই কি এই নীরবতা?

সুভাষচন্দ্রের উপরে অ-বাঙালীদের নাকি ভারি রাগ। এই অভিযোগ কি সত্য? ত্রিপুরী কংগ্রেসে যখন তিনি প্রেসিডেণ্ট্ হলেন সীতারামিয়াকে হারিয়ে দিয়ে তখন সেই জয়লাভের পিছনে কি শুধু বাঙালীদের ভোট ছিল, না অ-বাঙালীদেরও ছিলো? অ-বাঙালীরা সব প্রদেশ থেকে যদি সুভাষকে ভোট দিয়ে থাকে তবে সেটা কি তাদের বাঙালী-বিদ্বেষের জন্য? সুভাষচন্দ্র যখন জিতলেন তখন হোলো সেটা গণতন্ত্রের জয়। পন্থ-প্রস্তাব যখন গৃহীত হোলো তখন কিন্তু গণতন্ত্রের জয় সহসা গণতন্ত্রের পরাজয় হয়ে গেল। কেন? কারণ যারা তাঁকে ভোট দিয়ে সভাপতি করলো তারা শেষ পর্য্যন্ত সবাই তাঁকে সমর্থন করলো না। সুভাষচন্দ্রকে ভোট দিলেই সেটা হোলো গণতন্ত্রের প্রতি অনুরাগের চিহ্ন;

সুভাষচন্দ্রকে ভোট না দিলেই সেটা হোলো ফ্যাসিবাদের জয়। যুক্তি মন্দ নয়। কিন্তু এই প্রশ্ন যদি করা যায়—এত গুলো লোক গণতন্ত্রের প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে রাতারাতি ত্রিপুরীতে এসে ফ্যাসিবাদের অনুরাগী হয়ে গেল, এমন একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘট্‌লো কেমন ক'রে? যারা পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সমর্থন করলো তারা তো বিলেত থেকে আসে নি। সুভাষচন্দ্রকে যারা ভোট দিয়ে সভাপতি করেছিল তারাই তাঁর বিপক্ষে চলে গেল। এ কি ত্রিপুরীর জল-হাওয়ার গুণে? কামরূপে গেলে লোকে ভেড়া হয়ে যায়—এ রকমের একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু ত্রিপুরীর সম্পর্কে তো এমন কিংবদন্তী প্রচলিত নেই। তা হ'লে সমস্যাটা কি সমস্যাই থেকে যাবে?

না, সমস্যার উত্তর আছে। সুভাষচন্দ্র যখন সভাপতির পদের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন তখন তিনি দক্ষিণপন্থীদের প্রতি কটাক্ষ ক'রে বলেছিলেন, এঁরা আপোষ ক'রতে চান সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে। ফেডারেশন গ্রহণ করবার জন্য দক্ষিণপন্থীরা উৎসুক—সুভাষের এই অভিযোগ ছিল দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে। আপোষবিরোধী বামপন্থীদের তরফ থেকে তিনি ছিলেন নির্ব্বাচনপ্রার্থী। ত্রিপুরীতে দক্ষিণপন্থীরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তিনি তাঁর ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধে যে অভি-যোগ এনেছেন তার কোনো প্রমাণ আছে কি? সুভাষচন্দ্র

নিরুত্তর। তিনি প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। যে সব ডেলিগেট্ সুভাষচন্দ্রকে ভোট দিয়েছিলেন তাঁর কথায় বিশ্বাস ক'রে, সুভাষকে দক্ষিণপন্থীদের প্রশ্নবানের সম্মুখে নিরুত্তর দেখে তাঁদের ভুল ভেঙে গেল। ত্রিপুরীতে ফাঁকি যখন ধরা পড়লো, দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মিতালীর অভিযোগ যখন ভিত্তিহীন ব'লে প্রমাণিত হোলো তখনই সুভাষের আসন টল্‌লো। পন্থ-প্রস্তাব ভোটাধিক্যে জয়লাভ করলো। ত্রিপুরী সুভাষচন্দ্রের ওয়াটার্লুতে পরিণত হোলো। এর জন্য দায়ী সুভাষচন্দ্র নিজেই। যে অভিযোগ তিনি তাঁর সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধে উপস্থিত করেছিলেন তা প্রমাণিত হয়ে গেলে পন্থ-প্রস্তাব কখনোই গৃহীত হ'তে পারতো না। যে অভিযোগ তিনি প্রমাণ করতে পারলেন না তা আনবার কি দরকার ছিলো? প্রেসিডেণ্ট্ হবার জন্য? কিন্তু You can deceive some people for all time and all people for some time but not all people for all time.

ত্রিপুরী থেকে সুভাষ জাম্‌ডোবায় ফিরলেন। তারপর কলিকাতায় প্রত্যাগমন। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং-কমিটী-গঠন অনেক দিন ধরে স্থগিত। সর্ব্বত্র একটা উৎকণ্ঠার ভাব। এমন সময় ডাকা হোলো ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন। জওহরলাল এলেন, গান্ধী এলেন,

আরও অনেকে এলেন। অনুপস্থিত কেবল বল্লভভাই। গান্ধীজী সোদপুরে সতীশবাবুর অতিথি। দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী উভয় দলেরই লোক মিলিয়ে ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করা হোক—এই ছিল সুভাষের প্রস্তাব। প্রস্তাব নিয়ে তিনি জওহরলালের সঙ্গে গান্ধীর কাছে উপস্থিত হোলেন। নানা দিক থেকে গান্ধীজীর সমর্থন পাওয়া তখন দরকার। উড্বার্ণ পার্ক থেকে মোটর হর্ণ বাজাতে বাজাতে অনেকবার সোদপুরে ছুটলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। গান্ধী যা সুভাষকে বল্লেন তার মর্ম্ম হ'চ্ছে, 'আমি বিভিন্ন মতের লোক নিয়ে কমিটী গঠনে বিশ্বাস করিনে। তাতে কথা কাটা-কাটি হয়, কাজ আগায় না। কমিটী 'হোমোজেনাস্' অর্থাৎ একমতের লোক নিয়ে হওয়া উচিত। কিন্তু আমি এই ওয়ার্কিং কমিটী গঠনের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করতে চাইনে। I do not wish to impose any cabinet on the President. You choose your owncabinet and face the A.I.C.C. তোমার ক্যাবিনেট তুমি নিজেই মনোনীত কর। তারপর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সভার সম্মুখীন হও তোমার ক্যাবিনেটের সদস্যদের নামগুলি নিয়ে।"

সুভাষচন্দ্র ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এ, আই, সি, সির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, সেখানে তাঁর কোয়ালিশন ক্যাবিনেটের প্রস্তাব টিঁকবে না—কারণ সভ্যেরা

অধিকাংশই গান্ধীজীর মতাবলম্বী অর্থাৎ তথাকথিত দক্ষিণপন্থী। তিনি কোয়ালিশন ক্যাবিনেটের প্রস্তাব উপস্থিত করলে তা প্রত্যাখ্যাত হবেই। অবস্থা সঙ্গীন দেখে তিনি পদত্যাগ করলেন। পণ্ডিত জওহরলাল তাঁকে বারম্বার অনুরোধ জানালেন সভাপতির পদে ইস্তফা না দিতে। কিন্তু সভাপতির পদে থাকতে হ'লে ক্যাবিনেটে গান্ধীপন্থীদের আধিক্যকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়; তা ক'র্লে তাঁর নিজের মতাবলম্বী লোকদের সেখানে কোনো প্রভাব থাকে না। এই পরাজয়কে স্বীকার ক'রে নিয়ে সুভাষ প্রেসিডেণ্ট্ থাকতে রাজী হোলেন না। তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। পদত্যাগ না করলে বামপন্থীদের কাছে মুখ দেখানো ভার হোতো। তারা বলতো—সভাপতির মুকুটের লোভে সুভাষ দক্ষিণপন্থীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। লোকটার কোনো মেরুদণ্ড নেই।

এই তো হোলো ঘটনার আসল বিবরণ। এর মধ্যে অভিযোগ করবার কি আছে, বুঝতে পারিনে। সুভাষচন্দ্র নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে নিজের অনুকূলে বেশীর ভাগ ভোট সংগ্রহ করতে পারলেন না—সে দোষ কি গান্ধীর না সরোজিনী নাইডুর? 'চিলে কান নিয়ে গেল'—এই শুনে চিলের পিছনে পিছনে ছুটবার মনোবৃত্তি কি বদলাবে না?

তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম গান্ধীজী বাঙালীর প্রতি

তেমন সন্তুষ্ট নন যদিও বাংলার শান্তিনিকেতনে এ্যানড্রুজের স্মৃতি রক্ষার জন্য সেদিনও বোম্বাই থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা তুলে বাংলাকে দান করলেন। টাকাটা গুজরাটে ব্যয় হবে না, হবে বাংলাতে। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলালও যে সুভাষের বিরুদ্ধে গেলেন সেটা কি তাঁরও বাঙালী-বিদ্বেষের পরিচয় ? বল্লভভায়ের হাড়ে বাঙালী বিদ্বেষ না হয় তর্কের খাতিরে ধরা গেল। কিন্তু খাঁ আবদুল গফ্‌ফর খাঁ, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত ভূলাভাই দেশাই—এঁদেরও কি তাই ? এই সব লোক সহসা কেন বাংলার উপরে এতটা ক্ষেপে গেলেন—বোঝা মুস্কিল। বাংলা দেশ এঁদের কারো পাকা ধানে তো মই দেয়নি। মনে মনে একটা আশঙ্কা হয়—আমরা বাঙালীরা নিজেরাই ক্ষেপে যাইনি তো ? দু একজন পাগলের সেবা করতে গিয়ে দেখেছি—পাগল কাকেও বিশ্বাস করে না, মনে করে খাবারের সঙ্গে বিষ আছে। সেজন্য খেতে চায় না। পণ্ডিত জওহরলাল এবং গান্ধী থেকে সরোজিনী নাইডু, মৌলানা আজাদ এবং আবদুল গফ্‌ফর খাঁ পর্য্যন্ত সবাই সুভাষকে তাড়িয়েছে ষড়যন্ত্র ক'রে এবং তার কারণ বাংলার প্রতি তাঁদের বিতৃষ্ণা—এতগুলো মানুষকে এরকম ভাবে সন্দেহ করা কি সুস্থ মনের পরিচয় ? বিশ্ব শুদ্ধ সবাই আমাকে বিপন্ন করবার জন্য চক্রান্ত করেছে—এ রকমের মনোভাব একটা মানসিক রোগের লক্ষণ আর এই রোগকে বলে persecution-mania.

আমরা খুব সম্ভব 'ম্যানিয়া'তে ভুগছি—তাই গোটা ভারত-বর্ষকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছি। কারো কোনো কাজ নেই—তাই সবাই এক সঙ্গে মিলে বাংলাকে জাহান্নামে পাঠানোর কাজে লেগে গেছে—অন্য প্রদেশের নেতাদের সম্পর্কে কি হীন ধারণা! অথচ তাঁরা ত্যাগ করেছেন যথেষ্ট, দেশের জন্য কারাবরণ করেছেন বারংবার। দেশভক্তি কি আমাদেরই একচেটিয়া? আর-সবাই আছে কেবল বাঙালীকে বিপন্ন করবার তালে? আমরা এমন কি বড়ো হয়ে গেছি যে আমাদের দাবিয়ে রাখবার জন্য সকলের এত মাথাব্যথা? নিজেদের সম্পর্কে এই অত্যুচ্চ ধারণা পাগলামির কোঠায় এসে পৌঁছায় নি তো? ডাক্তারী শাস্ত্রে যাকে প্যারানুইয়া (Paranoia) রোগ বলে—আমরা কি সেই রোগে আক্রান্ত হয়েছি? মোটের উপরে লক্ষণ ভালো নয়। চিকিৎসার প্রয়োজন।

উপসংহারে

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর স্বরূপ যে কি তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। যিনি বিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে ভাবেই হউক অখণ্ড ভারতকে রূপদান করিতে নিযুক্ত, তিনি সুপটু অথবা অপটু পটুয়া, তাহা এখন যাচাই করা প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি রাষ্ট্রনেতা না হইলে হয়ত জীবদ্দশাতে তাঁহাকে তৌল করার কথা মনেই উঠিত না। অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রের মনিষীগণ অপেক্ষা দেশের রাজনীতিক্ষেত্রকে যাঁহারা স্বীয় জীবনের কর্ম্মস্থল করেন তাঁহাদের জীবনে গোপন কথা কিছু থাকিবার উপায় নাই—বিদেশে না হইলেও স্বদেশে তাঁ'দের জীবনের ছোট বড় সকল ঘটনাই প্রচারিত হইয়া পড়ে। তাই গান্ধীজীকে এখনই বিচার করা চলে। বিশেষত তাঁহার প্রকৃত মূর্ত্তি সম্বন্ধে বাংলাদেশের মনে যে সন্দেহ এতদিন ধূমায়িত হইতেছিল, এখন তাহা বহু বাঙ্গালীর অন্তরে বহ্নি হইয়া প্রকাশিত। এখনই সেই আলোকে গান্ধীজীর প্রাণের প্রদীপ পরীক্ষা করিয়া লইবার প্রকৃষ্ট সময়।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে আমরা যেরূপ সাধারণ মানুষ, গান্ধীজীকেও আমরা আমাদের মতন একজন স্বাভাবিক মানব-সন্তান মনে করি। অবতার-পুরুষ বা জীবন্মুক্ত পরমহংস কিংবা অতীন্দ্রিয়-অনুভূতি-সম্পন্ন ক্ষণজন্মা ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ যাঁ'রা তাঁ'দের থাক্ আলাদা—তাঁ'রা নিত্যমুক্ত স্বরাট।

তাঁদের নিকষে গান্ধীজীকে আমরা ঘসিয়া দেখিব না। তাই বলিয়া গান্ধীজীর চরিত্রে অসাধারণত্ব যে কিছু নাই, এমন বলিতেছি না। আমরা দেখিব তাঁকে জননেতা বা দেশের জীবন-স্রোতের উপরে ভাসমান জাতীয় তরণীর কর্ণধার অথবা ভারতবর্ষের ইহলৌকিক ধর্ম্মসাধনের নায়ক, চালক বা গুরু হিসাবে তিনি উপযুক্ত না অনপযুক্ত। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, স্বভাবচরিত্র, লোকব্যবহার ও আদর্শ আমাদিগের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করে কিনা—তথা জাতির বৃহৎ স্বার্থসাধনের অনুকূল কিনা—এই দুমুখো প্রশ্নটীর মাত্র আলোচনা আমরা বাঙ্গালীর দৃষ্টিভঙ্গীতে করিতে চাইয়াছি।

একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীকে আমরা বাছিয়া লইয়াছি বলিয়া সে সম্বন্ধে আমাদের সংস্থান কোথায় তাহা একটু ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। আমরা বাঙ্গালী—আমরা যাহা আজ চিন্তা করি, সমগ্র ভারতের চিদাকাশে তাহার বুদ্বুদ ওঠে আগামী কাল,—মনীষি গোখ্‌লে বঙ্গজননীর প্রাসাদতোরণে এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিয়া দেন। এই স্তুতিবাক্যকে অত্যুক্তি বলিতে আমরা বঙ্গবাসী স্বভাবতই চাহিব না এবং চাহিতেছিও না। তবে ঐ মন্তব্য হইতে আমরা বাঙ্গালীর চরিত্রগত লক্ষণাবলীর সিদ্ধান্ত করিতে চাই এইরূপে যে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী জাতি। বাঙ্গালী অতি সহজে ও শীঘ্র জটিল তত্ত্বের অন্তর্নিহিত গুঢ় রহস্য ভেদ করিয়া তাহার মীমাংসিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। ফলে আলাপে, আলোচনায়, লেখায় বা বক্তৃতায় দুরূহ সমস্যার সমাধান করা বাঙ্গালীর পক্ষে আদৌ হতবুদ্ধিকর নয়। শানিত-বুদ্ধির প্রভাবে বাঙ্গালী হইয়াছে চিন্তায় সার্ব্বভৌম এবং সে বিষয়ে

অতি মাত্রায় সচেতন। কিন্তু প্রত্যেক জিনিষেরই দুইটি দিক আছে। এক্ষেত্রেও প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিণতিরূপে কতকগুলি ত্রুটি বা অভাব বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রে সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে। সিদ্ধি বাঙ্গালীর বুদ্ধিগোচর বলিয়া সাধনায় তাহার তেমন অনুরাগ নাই। অপরের দৃষ্টিভঙ্গী হৃদয়ঙ্গম করিতে সময় লাগে না বলিয়া আমরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। নিজের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় অভ্যস্থ বলিয়া মৌলিকতাভিমানী নেতৃত্ব করা বাঙ্গালীর স্বভাব—নেতার অনুগমন তাহার ধাতে সয় না। বাঙ্গালী কায়িক শ্রমে অত্যন্ত অপটু ও বাক্যে মহাবীর, সঙ্গে সঙ্গে নিজের অপেক্ষা পরের দোষদর্শনে ও কীর্ত্তনে বিশেষ তৎপর; কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার ক্ষমতা তাহার অসাধারণ। আচার্য্য রায় অনেকদিন আগেই বলিয়াছেন যে বাঙ্গালী সাধনা না করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে চায়। চিন্তার সাহসিকতা থাকায় আমরা অতি সহজে সংস্কারত্যাগের দুঃসাহসে পটু এবং নিজেদের দিক হইতে বিচার করিয়া অন্য সকলের উপর নৈতিক সংস্কারসমূহের প্রভাব সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে। আদর্শবাদে আমাদের অধিকার কর্ম্মসাধনার মর্য্যাদাবোধে আমাদিগকে অজ্ঞ করিয়াছে এবং সেই অন্ধকার ছিদ্রপথে অসূয়া, পরশ্রীকাতরতা, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি বিষধরগুলি আমাদের মনের অবাসে আজ প্রবেশ করিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। আমাদের চারিত্রিক কাঠামোর আরও অনেক দিক দেখিবার থাকিলেও উপস্থিত যেগুলি লক্ষ্য করা হইল তাহাতেই আমাদের বর্ত্তমানের প্রয়োজন মিটিতে পারিবে।

এখন বাংলাদেশে গান্ধীভক্ত যদিও আছেন, গান্ধীবিদ্বেষীই কিন্তু বেশী। উভয় দল সকল প্রদেশেই আছে; কিন্তু বাংলার গান্ধী-বিদ্বেষ

যেন চরমে উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার সূত্রপাত হয় দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদল গঠনের সময় হইতে। দেশবন্ধু অবশ্য বিদ্বেষ ছড়ান নাই। কিন্তু সেই সময়ে বা তাহর কিছু পরে বাগ্মী বিপিনচন্দ্র প্রমাণ করিতে চান যে শ্রীযুক্ত গান্ধীর আন্দোলনে কিছুই নূতনত্ব নাই,—বাঙ্গালী বঙ্গভঙ্গোপলক্ষে যাহাই করিয়াছিল, তাহারই পুনরাবৃত্তি গান্ধী করিতেছেন। সেই হইতেই বাংলা যেন গান্ধী-মোহমুক্ত হইতে লাগিল। তারপর দেশবন্ধুর তিরোধানে দেশপ্রিয় যখন গান্ধীজী কর্ত্তৃক তাঁহার স্থানে মনোনীত হইলেন, তখন হইতে গান্ধীবিদ্বেষ বাংলায় ধূমায়িত হইতে লাগিল। সেই ধূমাচ্ছন্ন অগ্নি দেশ-গৌরবের কংগ্রেস-ত্যাগকে উপলক্ষ করিয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অধুনা গান্ধীভক্তের দলছাড়া গান্ধীকে শ্রীযুক্ত বা মিষ্টার গান্ধী বলিতেও বাঙ্গালীর প্রবৃত্তি হয় না—মহাত্মাজী বা মহাত্মা গান্ধী বলা ত দূরের কথা; কারণ দেশ-ভৈববদের চক্ষে গান্ধী মহাত্মা নহেন, দুরাত্মা। ·গান্ধী এখন শেষোক্ত বাঙ্গালীর চক্ষে বঙ্গবিদ্বেষী, পক্ষপাতদুষ্ট, ঈর্ষাপরায়ণ, কুচক্রী, স্বনেতৃত্বের জন্য যেন-তেন-প্রকারেণ বদ্ধপরিকর এবং দেশের যথার্থ উন্নতির পরিপন্থী। এই সকল নিন্দাবাদের মনস্তত্ত্বমূলক পটভূমিকায় আমাদের জাতীয় চরিত্রের পূর্ব্বোক্ত গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে অকর্ম্মা বাঙ্গালীর কাছে কর্ম্মযোগী গান্ধীজী বঙ্গবিদ্বেষী, পক্ষপাতদুষ্ট ও ঈর্ষাপরায়ণ ত হইবেনই। বংশগত বা সমাজগত ধর্ম্মানীতিমূলক সংস্কারত্যাগের চশমাতে সত্যাশ্রয়ী মহাত্মাজীকে কুচক্রী দেখাইবে, সন্দেহ নাই। আমাদের মধ্যে বিনয়ের (discipline) একান্ত অভাব থাকায় নেতার নেতৃত্ব আমাদের অসহ্য। পরানুকরণ বা স্বধর্ম্মত্যাগের পরিণতিই আমাদিগকে

এমন অন্ধ করিয়াছে যে গান্ধীজী-নির্দ্দিষ্ট আমাদের যথার্থ মঙ্গলের পথ আমাদিগের তথাকথিত অগ্রগতিরোধ করিবে বলিয়া আমরা সন্দেহ করিতেছি। আমরা আমাদের সেই সন্দেহকে প্রশ্ন করিয়া দেখাও প্রয়োজন মনে করি না যে কূটকৌশলী যাঁহারা আপনা-দিগকে প্রগতিপরায়ণ মনে করেন সেই মুষ্টিমেয় কয়জন ও তাঁহাদের প্রভাবান্বিত দেশবাসী ছাড়া দেশের আত্মবিস্মৃত, নিরানন্দ, মূক জন-সাধারণ গান্ধীজীকে কি চক্ষে দেখেন? সর্ব্বাঙ্গীন সাম্যবাদের কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার অমর ভাষায় সে প্রশ্নের উত্তরে "গান্ধীজী" কবিতায় লিখেছেন,—

> "বাতায়নে ছাখ্ কিসের কিরণ! নব জ্যোতিষ্ক জাগে
> জনসমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন্ চন্দ্রের অনুরাগে।
> জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশান-ধারী,
> পথ চায় কার কাতারে কাতার উৎসুক নরনারী!"

বাংলাদেশে কেবলমাত্র দলগত-স্বার্থপরায়ণ-পত্রিকাপাঠে পণ্ডিতম্মন্য বা পরচর্চ্চাসংঘের উৎসাহী সভ্য অথবা চর্ব্বিতমস্তিষ্ক তরুণ-তরুণীদের কথা ছাড়িয়া দিয়া যাঁহারা সত্য জানিতে প্রয়াসী বা অভিলাষী তাঁহাদের জন্য গান্ধীবাদের মৌলিক মূল তত্বগুলি লইয়া যে সকল আলোচনা কবি বিজয়লাল সম্প্রতি করিয়াছেন সেগুলি ও তার সঙ্গে তাঁহার দুইটি নূতন প্রবন্ধ সংকলন করিয়া এই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইল। চারণকবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় নিস্প্রয়োজন; কারণ তিনি যে গান্ধীপন্থী দেশসেবক ও বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। স্বমত ও পথের জন্য অশেষ ত্যাগশীলতার যে নিজস্ব মর্য্যাদা আছে তাহারই জন্য আমরা তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ

প্রকাশে ব্রতী ও সাহসী হইয়াছি। তিনি সুলেখক, তাঁহার লেখার সব দিক বিচার করিবার প্রয়োজন প্রকাশকের নাই—পাঠক-সমাজকে সে ভার দিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত। আমরা এইমাত্র অনুধাবন করিয়াছি যে মহাত্মা গান্ধী উল্লিখিত বা তদনুরূপ নিন্দা-বাদের বহু উর্দ্ধে; তাঁহার আদর্শনিষ্ঠা, সত্যসাধনা, দেশপ্রেম ও বুদ্ধিমত্তাকে ঐ সকল সংকীর্ণতা স্পর্শই করিতে পারে না—তিনি যথার্থই বৈষ্ণব, 'বোষ্টম' নহেন। নিন্দুকের নিন্দা তাঁহার কর্ম্ম-কুশলী অনুচরবর্গের সহিত প্রতিযোগীতায় পরাভব স্বীকারেরই নামান্তর। সে নিন্দাও আবার তাঁহাদের প্রতিযোগীরা বা সমকক্ষরা করেন না, করেন তাঁ'দের অলস অনুরক্তগণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বল্লভভাইএর বাঙ্গালীবিদ্বেষ, পণ্ডিত মালব্য ও বীরেন্দ্র অশুতোষের অনুরূপ সুনামের সহিত তুলনীয়। যাঁহারা পরের মুখে ঝাল খাইতে ভালবাসেন না, নিজেরা দেখিয়া শুনিয়া পড়িয়া বুঝিয়া বিচার করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য কবি বিজয়লাল পূর্ব্বে "ঝটিকার উর্দ্ধে", "দ্রষ্টার চোখে", "সেনাপতি গান্ধী" প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াও এবারে অধিকতর শৃঙ্খলার সহিত বাঙ্গালীর চক্ষে গান্ধী-বাদের আলোচনা করিলেন এই তাঁহার "হে রুদ্র সন্ন্যাসী"তে।

এই পুস্তিকা প্রকাশে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মামুলিপ্রথায় ধন্যবাদ প্রদানের লৌকিকতা করিতে মন সংকুচিত হয়—তদপেক্ষা অনেক বেশী শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র তাঁহারা। তন্মধ্যে শ্রদ্ধেয় "প্রবাসী" সম্পাদক মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের "গ্রামে ও পথে" পুস্তকের প্রকাশক শ্রীযুক্ত অজিত-কুমার বসু মহাশয়ের সৌজন্যে এই পুস্তকের যথাক্রমে ভিতর ও বাহিরের ছবি দুইখানি আমরা পাঠকগণকে উপহার দিতে

পারিলাম। ধন্যবাদার্হ বরং তাঁহারাই যাঁহাদের হৃদয়হীন বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য গান্ধীজীর অনিন্দ্যসুন্দর চরিত্রালোচনার আনন্দ-লাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটিল।

তবে সামান্য মানুষ আমরা—বিশেষ কিছুই আমাদের ভিতর না থাকার একটা দাবী আমাদের আছে। সেই আমাদের কাছে কি ভাবে গান্ধীচরিত্র প্রতিভাত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার একটু আভাস দিবার অভিপ্রায়েই এই যবনিকার বিস্তার। উদ্দেশ্য এই যে এই অতি সাধারণ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের উপর মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব পর্য্যালোচনা করিয়া আপামরসাধারণ বঙ্গবাসী—যাঁহারা অসামান্য নহেন—তাঁহারা এই সাধারণতন্ত্রের যুগে তাঁহাদের ধারণা পরিবর্ত্তনের অবকাশ পাইতে পারেন।

মহাত্মাজী যখন সমগ্র ভারতকে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্ররূপে প্রকাশ্যে গ্রহণ করিলেন, তখন আমরা যুবক। তৎপূর্ব্বেই আমাদের ধারণা হইয়া গিয়াছে যে ভারতের বর্ত্তমান যুগপ্রবর্ত্তক হইতেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ। আমরা আমাদের তখনকার বুদ্ধিতেই বুঝিয়া লইয়াছিলাম যে মহাত্মা-প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের চারিটি আশ্রয়স্তম্ভ—অহিংসা (সত্যসন্ধ অভয়মন্ত্রপূত ত্যাগযজ্ঞ), চরকা (শ্রমশিল্পপ্রধান পল্লীসমাজ-গঠন), ঐক্য (হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি 'মত ও পথে'র সমন্বয়সাধন) এবং প্রেম (অস্পৃশ্যতাদি বৈষম্যের নিরাকরণে দুর্জ্জয় শক্তিসাধনা) যুগাবতার-নির্দ্দিষ্ট চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্মপন্থা। তারপর লক্ষ্য করিলাম যে মহাত্মাজীর আন্দোলন আমাদের মত অহল্যা পাষাণীকে সজীব করিল অর্থাৎ আমাদের অনড় তামসিক মনকে এমন নাড়া দিল যে নিজেদের জীবনের পূর্ব্বাপর ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বীয় স্বধর্ম্ম

অন্বেষণে ব্যাপৃত হইলাম এবং তাহার ফলে স্বধর্ম্মসাধনার সৌভাগ্য না ঘটিলেও নিজেরা যে কতখানি অধঃপতিত হইয়াছি এবং তাহার করণকারণই বা কি তাহা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়াছি। মনে স্থির নিশ্চয় ধারণা জন্মিয়াছে যে অখণ্ড ভারতবর্ষের নাড়ীজ্ঞান মহাত্মাজীর মত অন্য কোন রাষ্ট্রনেতার হয় নাই। সাধক গান্ধীজী তাঁহার সাধনা দ্বারা হিন্দুস্থানের সহিত নিজ চিত্তের যে যোগসাধন করিয়াছেন, তাহাতে ঐ একটি মানুষকে লক্ষ্য করিলেই বর্ত্তমান ভারতের সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, শুচিঅশুচি, তৃপ্তিঅতৃপ্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা—সবই অনুমান করা যায় এবং অন্যান্য নেতৃপদবাচ্য-গণের মধ্যে অসামান্য প্রতিভা হাজার থাকিলেও তাঁহাদের কাহারও সম্বন্ধে একথা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলা যায় না।

আমরা মহাত্মাজীকে আমাদের মনের রঙ্গমঞ্চে উক্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ দেখি বলিয়াই বোধ হয় প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে পুলকিত হই। তিনি সম্প্রতি একবার 'ভারতবন্ধু' ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন সমাজতন্ত্রবাদ অনেকেই প্রচার করেন কিন্তু গান্ধীজীর মত কথায় নয়, কাজে সমাজতান্ত্রিক আর কে আছেন? সে প্রশ্নের অবশ্য আজও কেহ উত্তর দিতে পারেন নাই—যেমন পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায় একুশ বৎসর পূর্ব্বে সারা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলেন মহাত্মাজীর মত অনুপম চরিত্রের জননেতা দেখাইতে, সে আহ্বানেরও কেহ সম্মুখীন হইতে পারে নাই। আমরা কিন্তু কবিগুরুর সে উক্তির কথা বলিতেছি না। যে আলোকসামান্য প্রতিভাবলে রবীন্দ্রনাথ বিগত সন ১৩১১ সালে একটি প্রবন্ধে ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত লিখিয়াছিলেন

"নিরস্ত্র, নিঃসত্ত্ব, নিরন্ন ভারতের দুর্ব্বলতাই ইংরেজসাম্রাজ্যকে বিনাশ করিবে" তিনিই ঐ প্রবন্ধের সম সমকালে সম্ভবত সন ১৩১০ সালের শুভ নববর্ষে তাঁহার অতি আদরের শান্তিনিকেতনে ধ্যানে বসিয়া সমাহিতচিত্তে নিজ বিরাট হৃদয়ের অন্তরবেদনা ব্যক্ত করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেনঃ "···দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে, অনুকরণে এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। সংযমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা এই মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোকব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্ম্মরক্ষায় দৃঢ়ত্ব দান করিয়াছে। শান্তির মর্ম্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে, স্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। বহু দুর্গতির মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত এই স্থির শক্তিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এবং সময়কালে এই দীনহীনবেশী ভূষণহীন বাক্যহীন নিষ্ঠাদ্রঢ়িষ্ঠ শক্তিই জাগ্রত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে আপন বরাভয়হস্ত প্রসারিত করিবে,...,—তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্রাবিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ, ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাস-ব্রতধারী—তাহার কৃশপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমাগ্নি এখনো জ্বলিতেছে। আর আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য, যাহা আমাদের স্বরচিত

যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্‌গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা যদি কখনও ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব, ঐ অবিচলিত-শক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্তচক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজুট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে ;—যখন ঝড়ের গর্জ্জনে অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজি বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণবাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণ-ঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া

আমরা যখনই ঐ কয় ছত্র পড়িয়াছি বা এখনও পড়িতে যাই, তখনই সবরমতী নদীতীরস্থ আশ্রমের কূলপতি গান্ধীজীর মূর্ত্তি আমাদের মানসনয়নে ভাসিয়া উঠে এবং মনে হয় যে যথার্থ মহাত্মা পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেন এবং যদিবা পরাধীনাবনত ভারতের ভাগ্যে আজ একজন সেইরূপ ক্ষণজন্মা নেতৃলাভ ঘটিয়াছে, বঙ্গদেশ কি এমনই হতভাগ্য যে তাঁহাকে চিনিবে না এবং তাঁহার কাছে সমিধপানি সত্যকামের মত উপনীত হইয়া ধন্য হইবে না ?

জয়নগর
জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা '৪৯

প্রকাশক